ইলিশ মাছ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা কৌশল

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
ঢাকা-১০০০

ইলিশ মাছ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা কৌশল

রচনা ঃ
ড. জি. সি. হালদার, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
মোঃ রফিকুল ইসলাম, মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব), মৎস্য অধিদপ্তর

প্রথম প্রকাশ ঃ ভাদ্র ১৪১০

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
ফাল্গুন ১৪১৪

প্রকাশনায় ঃ
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

গ্রন্থস্বত্ব ঃ
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

Hilsa Fisheries Conservation, Development and Management Technique

Written by:
Dr G. C. Haldar, Chief Scientific Officer, Bangladesh Fisheries Research Institute
Md. Rafiqul Islam, Director General (c.c.), Department of Fisheries

First Publication : August 2003
Second Edition : March 2008

Published by: Department of Fisheries, Bangladesh
Matshya Bhaban, Ramna
Dhaka –1000

Copyright : Department of Fisheries, Bangladesh

প্রকাশকঃ
মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা-১০০০

দ্বিতীয় সংস্করণঃ
ফাল্গুন, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ

গ্রন্থস্বত্বঃ
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণঃ
সুন্দরবন এ্যাডভার্টাইজার্স
ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

প্রচার সংখ্যাঃ
৭,০০০ (সাত হাজার) কপি
(সৌজন্যমূলক বিতরণের জন্য)

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	ইলিশ মাছের গুরুত্ব	০৭
২.	ইলিশ মাছের প্রজাতিগত বৈচিত্র, আন্তর্জাতিক বিস্তৃতি ও উৎপাদন	০৮
৩.	টেনুয়ালোসা ও হিলশা গণের মাছের পার্থক্য নির্ণয়	০৮
৪.	বাংলাদেশে ইলিশ মাছের বিস্তৃতি	০৯
৫.	বাংলাদেশে ইলিশ উৎপাদনের গতিধারা	১০
৬.	ইলিশ মাছ আহরণ পরিসংখ্যান নিরূপণের সীমাবদ্ধতা এবং উন্নয়ন কৌশল	১২
৭.	জালের ফাঁসের দৈর্ঘ্য (Mesh size) পরিমাপ পদ্ধতি	১৩
৮.	ইলিশ মাছ ধরার প্রধান মৌসুম, জাল ও যন্ত্রপাতি	১৩
৯.	ইলিশ মাছের জীববিদ্যা (Biology)	১৫
১০.	ইলিশ মাছের প্রধান প্রধান প্রজনন ক্ষেত্র ও ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব	১৯
১১.	জাটকা ইলিশের বিচরণ ক্ষেত্র, জাটকা ধরার জাল, মৌসুম ও পরিমাণ	২০
১২.	জাটকা ও চাপিলা মাছের পার্থক্য নির্ণয়	২৪
১৩.	ইলিশ মাছের বয়স, দৈর্ঘ্য ও ওজন বৃদ্ধির হার এবং দেশে আহৃত মাছের গড় দৈর্ঘ্য ও ওজন	২৫
১৪.	মাছের মজুদ (Stock) নিরূপণের ফলাফল, ফলাফলের সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশনা	২৭
১৫.	ইল্ড পার রিক্রুট (Y/R), ইলিশ মাছের প্রথম ধরার বয়স ও আহরণ মাত্রার সম্পর্ক	২৯
১৬.	ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা ও ব্যবস্থাপনা কৌশল	২৯
১৭.	ইলিশ ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়ন পদ্ধতি	৩০
১৭.১	১ডিমওয়ালা মাছ সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক প্রজনন বৃদ্ধি	৩১
১৭.২	জাটকা সংরক্ষণ ৩৭	৩১
১৭.৩	প্রাকৃতিকভাবে ছোট আকারের ইলিশ প্রতিপালন করে উৎপাদন বৃদ্ধি	৩৩
১৭.৪	ইলিশ মাছের প্রজাতিগত বৈচিত্র সংরক্ষণ	৩৪
১৭.৫	ইলিশ মাছের অতি আহরণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণ	৩৪
১৭.৬	ইলিশ মাছের আবাসস্থল ও পরিবেশ উন্নয়ন এবং সংরক্ষণের উপায়	৩৫
১৭.৭	ইলিশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি	৩৫
১৭.৮	ইলিশ মাছের আহরণ পরিসংখ্যান উন্নয়ন	৩৫
১৭.৯	প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন	৩৫
১৭.১০	ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা বৃদ্ধি	৩৬
১৭.১১	ইলিশ ব্যবস্থাপনার জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা	৩৬
১৭.১২	ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য দক্ষ জনবল তৈরী, জনবল ও অবকাঠামো জোরদারকরণ	৩৬
১৭.১৩	ইলিশ ও জাটকা জেলেদের পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা	৩৬
১৭.১৪	ইলিশ জেলেদের জন্য বীমা ব্যবস্থার প্রচলন ও সুদমুক্ত ঋণ প্রদান	৩৬
১৭.১৫	ইলিশ মাছ পরিবহণ, বাজার জাতকরণের পদ্ধতি উন্নয়ন এবং মান-নিয়ন্ত্রণ	৩৭
১৭.১৬	ইলিশ মাছের বিভিন্ন প্রোডাক্ট তৈরী ও রপ্তানি বৃদ্ধি	৩৭
১৮.	ইলিশ ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	৩৮
১৯.	ইলিশ ব্যবস্থাপনা কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুফল	৩৮
২০.	ইলিশ সংরক্ষণ আইন ও আইন ভংগের সাজা	৩৯
২১.	সহায়ক তথ্য গ্রন্থ	৪০

মানিক লাল সমদ্দার
মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

১৫ ফাল্গুন, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ
২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ খ্রীষ্টাব্দ

বাণী

দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে মৎস্য সম্পদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছের অবদান প্রায় শতকরা ৪২ ভাগ এবং ইলিশ মাছের অবদান এককভাবে প্রায় শতকরা ১৩ ভাগ। একক প্রজাতি হিসাবে ইলিশ মাছ সর্ববৃহৎ এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাই মাছের রাজা ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। প্রকৃতির এ অশেষ নিয়ামত যুগ যুগ ধরে আহরণ করা হচ্ছে। কিন্তু দেশের বিভিন্ন নদ-নদীর নাব্যতা হ্রাস, পলি ভরাট, জলজ পরিবেশ দূষণ, জাটকা ও ছোট আকারের ইলিশ অতি মাত্রায় আহরণ ইত্যাদি বহুবিধ কারণে উজানের নদ-নদীতে ইলিশ মাছের উৎপাদন দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। জাতীয় স্বার্থে এ মাছের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের জন্য অনেক কিছু করা প্রয়োজন।

ইলিশ সম্পদ উন্নয়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর "ইলিশ মাছ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা কর্ম-পরিকল্পনা" প্রণয়ন করে বাস্তবায়ন করছে। উক্ত কর্ম-পরিকল্পনা সফলভাবে বাবস্তবায়ন করার জন্য মৎস্যজীবি, মৎস্য ব্যবসায়ী, বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততা, ব্যাপক গণসচেতনতা এবং মাঠ পর্যায়ে ইলিশ মাছের জীবন ধারার বিজ্ঞান সম্মত সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত এবং জ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ও প্রচার প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে পুস্তিকাটির পরিমার্জিত ২য় সংস্করণ প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

আশা করি দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইলিশ মাছ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে এবং সকল স্তরের জনগণকে এ কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ ও ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টিতে এ পুস্তিকাটি সহায়ক হবে। এ সেক্টরে সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টায় আবার নদ-নদী ইলিশ মাছে ভরে উঠুক আমি এ কামনা করছি।

(মানিক লাল সমদ্দার)

সচিব
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

১৫ ফাল্গুন, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ
২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ খ্রীষ্টাব্দ

বাণী

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। আবহমান কাল হতে আমাদের গ্রামীণ জনগোষ্ঠির আত্ন-কর্মসংস্থান, আয়-উপার্জন ও প্রাণীজ আমিষের যোগানদাতা হিসেবে এ মাছ অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এক সময় পদ্মা, মেঘনা, গড়াই, মধুমতি, চিত্রা, ভদ্রা, ধলেশ্বরী, কালিগঙ্গা, নবগঙ্গা ইত্যাদি নদ-নদীতে প্রচুর পানি গড়াত, সাথে ইলিশেরও বান ডাকত। কিন্তু কালের প্রবাহে পদ্মা, গড়াই, মধুমতি, চিত্রা, ভদ্রা, কালিগঙ্গা, আজ পর্যাপ্ত পানির অভাব, নেই ইলিশের প্রাচুর্য। এ সকল নদ-নদী হারাচ্ছে যৌবন, আর ইলিশ গভীর সাগরে করছে পরিভ্রমণ।

তাই ইলিশ রক্ষায় সর্বাত্নক উদ্যোগ গ্রহণের এখনই উপযুক্ত সময়। আমাদের সীমিত সম্পদের জন্য অতিতে ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি মৎস্য অধিদপ্তর ইলিশ মাছ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক বাস্তবায়ন করছে। সরকার ইতোমধ্যে ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য রাজস্ব খাতের অধীনে একটি উপ-খাত সৃষ্টি করে অর্থের যোগান দিচ্ছে। জেলেদেরকে খাদ্য সহযোগীতা প্রদান পূর্বক বিকল্প কর্মসংস্থানের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইলিশ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে দেশে এ মাছের উৎপাদন বিগত ২০০২-০৩ সালের তুলনায় চলতি বৎসর প্রায় ৪০% বৃদ্ধি পেয়ে ২,৮০,০০০ মে. টনে উন্নীত হয়েছে। জাটকাসহ ছোট আকারের ইলিশ মাছ কার্যকরভাবে রক্ষা করা সম্ভব হলে ইলিশ মাছের উৎপাদন ৪.০-৫.০ লক্ষ মে. টনে উন্নীত করা সম্ভব বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা কর্ম-পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকল স্তরের জনসাধারণের ব্যাপক সম্পৃক্ততা এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাঠ পর্যায়ে বিস্তার প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ইলিশের উপর প্রাপ্ত সর্বশেষ জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধ্যান-ধারণা, দিক নির্দেশনা ও ইলিশ কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুফল অন্তর্ভূক্ত করে ইলিশ মাছ সংরক্ষণ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা শিরোনামের পুস্তিকাটি পরিমার্জন করে দ্বিতীয় সংরক্ষণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করি, পুস্তিকাটি পূর্বের ন্যায় ইলিশ সংশ্লিষ্ট সকলের তথ্য ভান্ডার রূপে কাজ করবে এবং ইলিশ মাছ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

(সৈয়দ আতাউর রহমান)

মুখবন্ধ

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। জাতীয় অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও আমিষ জাতীয় খাদ্য সরবরাহে আবহমানকাল হতে এ মাছ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান দশকে দেশে গড়ে প্রায় ২.৫ লক্ষ মে.টন ইলিশ মাছ উৎপাদিত হচ্ছে। প্রতি কেজি ২০০/- টাকা হারে যার মূল্য প্রায় ৫,০০০ কোটি টাকা। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে ইলিশ মাছের অবদান প্রায় ১৩%। প্রায় ৪.৫ লক্ষ জেলে পূর্ণ অথবা খন্ডকালীন ভাবে ইলিশ আহরণে এবং ২০-২৫ লক্ষ লোক বিপণন ও অন্যান্য কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জড়িত। জি.ডি.পি. তে ইলিশ মাছের অবদান প্রায় শতকরা ১ ভাগ।

সাম্প্রতিক কালে দেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ইলিশ মাছের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। ইলিশ মাছের অতি-আহরণ, আহরণকৃত মাছের গড় আকার হ্রাস, অধিক মাত্রায় ডিমওয়ালা মাছ ও জাটকা আহরণ ইত্যাদি কারণ ইলিশ মাছের সহনশীল উৎপাদনে বাঁধা হয়ে দাড়িয়েছে। এছাড়া পরিবেশ দূষণ, বিভিন্ন নদ-নদীর উপর বাঁধ নির্মান, ফারাক্কা বাঁধ ইত্যাদি কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নদ-নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস পেয়েছে এবং ইলিশ মাছের আবাসস্থল ধ্বংস হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে, ইলিশ মাছের সহনশীল উৎপাদন বজায় রাখা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের ৪র্থ মৎস্য প্রকল্পের জি.ই.এফ. অংশের অধীনে ইলিশ মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করতঃ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

উক্ত কর্ম-পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক গণসচেতনতা তৈরী করা আবশ্যক। এছাড়া ইলিশ সংক্রান্ত গবেষণার সর্বশেষ ফলাফল ও বাস্তবজ্ঞান অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ সকল অংশগ্রহণকারী এবং সুফলভোগীদের মাঝে বিস্তার করাও একান্ত জরুরী। এ যাবৎ ইলিশ মাছের উপর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গবেষণা কাজ হলেও গবেষণা কাজের ফলাফল, তথ্য-উপাত্ত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক জার্নাল ও প্রতিবেদনে বিক্ষিপ্তভাবে আছে। ফলে উক্ত গবেষণা ফলাফল, তথ্য-উপাত্ত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিকট সহজলভ্য নয়। এছাড়া বাংলাদেশে ইলিশ মাছের উপর প্রকাশিত বই-পুস্তকও অত্যন্ত অপ্রতুল। এ প্রেক্ষাপটে সর্বশেষ গবেষণা ফলাফলের আলোকে এ সম্পদ ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য বিষয় সমূহ অন্তর্ভূক্ত করে ২০০৪ সালে পুস্তিকাটি প্রকাশ করা হয়েছিল। পুস্তিকাটি মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের তথ্য-উপাত্তের চাহিদা ব্যাপকভাবে পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে।

পুস্তিকাটির মজুদ ইতোমধ্যে শেষ হওয়ায় এটি পুনঃ মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এছাড়া ইলিশ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে এ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ অন্যান্য পরিবর্তন এবং নতুন তথ্য-উপাত্তের সংযোগ ঘটেছে। এ পর্যায়ে পুস্তিকাটি সংশোধন ও পরিমার্জন করে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। দ্বিতীয় সংস্করণে ইলিশ মাছের বৃদ্ধির হার, ধৃত মাছের গড় আকার ও ওজন, প্রাকৃতিকভাবে ইলিশ প্রতিপালন করে উৎপাদন বৃদ্ধি, ইলিশ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুফল, ইলিশ সংরক্ষণ আইন ইত্যাদি অধ্যায়সমূহ নতুনভাবে সংযোজন করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে পুস্তিকাটি পূর্বের ন্যায় মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা, সুফলভোগী এবং সংশ্লিষ্ট সকলের **সহায়ক তথ্য পুস্তিকা হিসেবে কাজ করবে** এবং ইলিশ মাছের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

পুস্তিকাটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে অধিদপ্তরের মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা শাখা বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এ শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রকাশক

ইলিশ মাছ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা কৌশল

১. ইলিশ মাছের গুরুত্ব

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ, একক প্রজাতি হিসাবে সর্ববৃহৎ এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। দেশের মৎস্য উৎপাদনে একক ভাবে ইলিশের অবদান প্রায় শতকরা ১৩ ভাগ। বার্ষিক গড় উৎপাদন প্রায় ২.৫ লক্ষ মে.টন যার মূল্য প্রায় ৫,০০০ কোটি টাকা। জি.ডি.পি.তে ইলিশ মাছের অবদান প্রায় শতকরা ১ ভাগ। জাতীয় রপ্তানি আয়েও ইলিশ মাছ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। ইলিশ মাছ ভারতে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে রপ্তানি করে প্রতিবৎসর প্রায় ১০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।

কর্মসংস্থানে ইলিশ মাছের অবদান

কর্মসংস্থানেও ইলিশ মাছ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের ৪০টি জেলার প্রায় ১৪৫টি উপজেলার ১৫০০টি ইউনিয়নের ৪,৫০,০০০ জেলে ইলিশ মাছ আহরণ করে। উক্ত জেলেদের মধ্যে গড়ে ৩২% সার্বক্ষণিক এবং ৬৮% খন্ডকালীন সময়ে ইলিশ মাছ আহরণ করে। ইলিশ ধরা ছাড়াও বিপনন, পরিবহণ, প্রক্রিয়াজাত করণ, রপ্তানি, জাল-নৌকা তৈরী ইত্যাদি কাজে সার্বিকভাবে প্রায় ২০-২৫ লক্ষ লোক জীবন-জীবিকার জন্য এ মাছের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। বাংলাদেশের ৬টি বিভাগের মধ্যে বরিশাল বিভাগেই ইলিশ জেলের সংখ্যা সর্বাধিক। দেশের দারিদ্র বিমোচনে ইলিশ মাছ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

খাদ্য সরবরাহে ইলিশ মাছের অবদান

বাংলাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সুস্বাদু মাছ ইলিশ। ইলিশ মাছ খাদ্য উপাদান এবং খাদ্যমানেও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এ মাছে উচ্চমাত্রায় আমিষ, চর্বি ও খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। ইলিশ মাছের চর্বিতে প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড থাকে। উক্ত অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডের প্রায় ২% ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড, যা মানুষের দেহের রক্তের কোলেসটেরলের মাত্রা হ্রাস করে হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। ইলিশ মাছের আমিষে ৯ ধরণের এ্যামাইনো এসিড পাওয়া যায় যা মানুষের পাকস্থলী উৎপাদন করতে পারেনা। এছাড়া ইলিশ মাছে রয়েছে উচ্চ পরিমাণ ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ ইত্যাদি। ইলিশের তেলে উচ্চ পরিমাণে ভিটামিন "এ, ডি" এবং অল্প পরিমাণ "বি" মেলে। ইলিশ মাছের কিছু ঔষধি গুণ (যেমন Flesh demulcent/Soothing, Stomachic, Phlegmatic, Carminative) আছে (চোপড়া ১৯৩৩)। ইলিশ মাছের যকৃতে ১২০ আই, ইউ পর্যন্ত ভিটামিন-এ পাওয়া যায়। এ মাছে গড়ে ৫৩.৭ ভাগ পানি, ১৯.৪ ভাগ চর্বি, ২১.৮ ভাগ আমিষ এবং অবশিষ্ট পরিমাণ খনিজ থাকে। ইলিশ হতে প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ খাওয়ার উপযোগী মাছ (flesh) পাওয়া যায়। ইলিশের স্বাদ ও গন্ধ এ মাছের তেলের পরিমাণ এবং ধৃত স্থানের পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। ইলিশের দেহস্থ সুঘ্রাণ এবং ভাজার সময় এর ঘ্রাণ আশ-পাশের উল্লেখযোগ্য দূরত্বে কেন ছড়িয়ে পড়ে তার কারণ জানা না থাকলেও ছোট একটি ইলিশ নিঃসৃত সুগন্ধি পার্থিব অনেক সুগন্ধিকেই হার মানায়।

লোকজ সাহিত্য সংস্কৃতিতে ইলিশ মাছের সম্পৃক্ততা

প্রাচীন বাংলা, সংস্কৃত সাহিত্য এবং লোকজ সংস্কৃতিতে ইলিশ মাছের স্বাদ, খাওয়ার পদ্ধতি এবং সংরক্ষণের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "ইল্‌শে গুড়ি" কবিতা এখনও আমাদেরকে আলোড়িত করে। প্রাচীন কালে লোকজনের বিশ্বাস ছিল যে, আশ্বিন-কার্তিক মাসের দূর্গা পূজার দশমির দিন হতে মাঘ-ফাল্গুন মাসের শ্রী পঞ্চমী (স্বরস্বতী পূজার দিন) পর্যন্ত ইলিশ মাছ ধরা এবং খাওয়া বন্ধ রাখা হলে এ মাছ বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের সুনাম (Fame), শক্তি (Strength), দীর্ঘ জীবন (Long life) এবং মহিমা বা গৌরব (Glory) বৃদ্ধি পায়।

২. ইলিশ মাছের প্রজাতিগত বৈচিত্র, আন্তর্জাতিক বিস্তৃতি ও উৎপাদন

ইলিশ মাছ ইন্ডিয়ান শ্যাড (Indian shad) নামে পরিচিত। ইলিশ বলতে প্রাক্তন *Hilsa* গণের মাছই বুঝায়। এ মাছ Clupeiformes বর্গের (Order) Clupeidae পরিবারের (Family) Alosinae উপ-পরিবারের (Sub-family) *Tenualosa* গণের (Genus) অন্তর্ভূক্ত। উক্ত *Tenualosa* গণটি দীর্ঘ দিন যাবৎ *Hilsa* গণ নামে পরিচিত ছিল। ফিসার এবং বিয়ানচি (Fisher and Bianchi, 1984) হিলশা গণটিকে *Tenualosa* গণভূক্ত করেন। সারা বিশ্বে *Tenualosa* গণের মোট ৫ প্রজাতির (Species) মাছ পাওয়া যায়। *Tenualosa* গণের পাঁচটি প্রজাতির মধ্যে বাংলাদেশে শুধুমাত্র *T. ilisha* বা ইলিশ এবং *T. toli* বা চন্দনা ইলিশ পাওয়া যায়। টেনুয়ালোসা গণের মাছ ছাড়াও হিলশা (*Hilsa*) গণভূক্ত হিলশা কেলি (*H. kelee/kanagurta)* প্রজাতির গুর্তা/কানাগুর্তা নামে ইলিশ মাছ বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে এবং পৃথিবীর অন্যান্য কয়েকটি দেশে পাওয়া যায়। এ প্রেক্ষাপটে "ইলিশ মাছ" বলতে *Tenualosa* গণের উক্ত দুই প্রজাতির এবং *Hilsa* গণের *H. kelee/kanagurta* বা গুর্তা ইলিশ অন্তর্ভূক্ত হবে।

T. ilisha প্রজাতির ইলিশ মাছ ভারত মহাসাগরের উত্তরাংশে (পারস্য উপসাগর হতে পূর্বদিকে মায়ানমার পর্যন্ত) বিস্তৃত এবং প্রধানত: বঙ্গোপসাগর অঞ্চলের দেশ সমূহে, কখনও কখনও শ্রীলংকার উপকূল, টনকিন উপসাগর এবং ভিয়েতনাম উপকূলেও পাওয়া যায়। চন্দনা ইলিশ, *T. toli* (মালয়েশিয়াতে তেরুবক নামে পরিচিত) ইন্দো-ওয়েষ্ট প্যাসিফিক (ভারত মহাসাগর হতে জাভা সাগর এবং দক্ষিণ চীন সাগর) অঞ্চলে এবং *T. macrura* পশ্চিম-মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে (মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, জাভা সাগর, সারাওয়াক প্রদেশের মোহনা ও নদ-নদী) এবং থাইল্যান্ডে (দক্ষিণ অংশে) পাওয়া যায়। *T. reevesii* (রিভেসি শ্যাড) এর বিস্তৃতি *T. toli* এর প্রায় অনুরূপ। *T. thibaudeaui* (লাওশিয়ান শ্যাড) দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মেকং রিভার সিস্টেম (ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া) ,থাইল্যান্ড-লাওসের বর্ডার এলাকায় পাওয়া যায়।

ইলিশ মাছের আন্তর্জাতিক উৎপাদন

T. ilisha প্রজাতির বিস্তৃতি অত্যন্ত ব্যাপক হলেও বঙ্গোপসাগরের উপকূল তথা বাংলাদেশ, ভারত এবং মায়ানমারে সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে ধরা পড়ে। মায়ানমার ও ভারতের ইলিশের গড় উৎপাদন যথাক্রমে প্রায় ১.০-১.২৫ এবং ০.৫০-০.৬০ লক্ষ মে:টন/বৎসর। সার্বিক ভাবে সারা বিশ্বে ইলিশ মাছের উৎপাদন প্রায় ৪.০-৫.০ লক্ষ টন। এর মধ্যে বাংলাদেশে ৫০-৬০%, মায়ানমারে ২০-২৫%, ভারতে ১৫-২০% এবং অবশিষ্ট ৫-১০% অন্যান্য দেশে ধরা পড়ে।

৩. টেনুয়ালোসা ও হিলশা (*Hilsa*) গণের মাছের পার্থক্য নির্ণয়

Tenualosa এবং *Hilsa* গণের মাছ ছাড়াও ইলিশা (*Ilisha*) গণের ৪ প্রজাতির মাছ যথা-*I. elongata* (রামগাছা/রামচৌকা), *I. melastoma* (পেতি চৌকা), *I. megaloptera* (চৌকা/চৌকা ফাইসা) এবং *I. filigera* (Coromondel ilish) বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় পাওয়া যায়। মৎস্য সংরক্ষণ আইন (Hilsa) বাস্তবায়নের জন্য অনেক সময় বিভিন্ন প্রজাতির ইলিশ মাছ এবং ইলিশ জাতীয় মাছের পার্থক্য নির্ণয়ের প্রয়োজন হয়। এ প্রেক্ষাপটে ইলিশ, চন্দনা ইলিশ এবং গুর্তা ইলিশ মাছের সনাক্তকরণের বৈশিষ্ট্য ও চিত্র নিম্নে প্রদান করা হলোঃ-

ইলিশ	চন্দনা ইলিশ	গুর্তা ইলিশ
১। পৃষ্ঠ পাখনায় ১৮-২১টি, বক্ষ পাখনায় ১৫টি, পেলভিক পাখনায় ৮টি এবং এনাল পাখনায় ১৮-২৩টি নরম কাটা (Soft ray) থাকে	১। পেলভিক পাখনায় ৮টি নরম কাঁটা থাকে	১। পৃষ্ঠ পাখনার ১৬-১৯, এনালফিনে ২১-২৩, পেলভিক পাখনায় ৮টি নরম কাটা থাকে। দেহের পিছনের দিকের আঁইশ ছিদ্রযুক্ত (Perforated) থাকে
২। বেলী স্কিউটস (বক্ষ কাটা) এর সংখ্যা ৩০-৩৩ টি	২। বেলী স্কিউটস এর সংখ্যা ২৮-৩০ টি	২। কোন তথ্য নেই
৩। গিল আর্চের নীচের অংশে ১০০-২৫০ টি গিল রেকার আছে	৩। গিল র‍্যাকার সংখ্যা ১০০-১৭৫ টি	৩। গিল র‍্যাকারের সংখ্যা ১০০-১৭৫ টি
৪। **পুচ্ছ পাখনা অপেক্ষাকৃত বড়**	৪। **পুচ্ছ পাখনা অপেক্ষাকৃত ছোট**	৪। কোন তথ্য নেই
৫। গিল ওপেনিং এর পরে **একটি কালো দাগ** এবং পরে বিশেষভাবে কিশোর ইলিশের ক্ষেত্রে অনেক গুলো দাগ থাকে	৫। গিল ওপেনিং এর পরে **একটি অস্পষ্ট কালো দাগ লক্ষনীয়** কিন্তু এর পর কোন কালো দাগ নাই	৫। গিলের ওপেনিং এর পরে **একটি কালো দাগ এবং এরপর ১০টি কালো দাগ থাকে**
৬। পুচ্ছ লোব মাথার মত লম্বা	৬। পুচ্ছ লোব **মাথার চেয়ে লম্বা**	৬। কোন তথ্য নেই
৭। উপর এবং নীচের চোয়াল সমান	৭। নীচের চোয়াল অপোকৃত বড়	৭। কোন তথ্য নেই
৮। পার্শ্ব রেখায় আঁইশের সংখ্যা ৪৫-৪৭ টি	৮। পার্শ্ব রেখায় আঁইশের সংখ্যা ৪০-৪১ টি	৮। পার্শ্ব রেখায় আইশের সংখ্যা ৩৯-৪৪ টি
৯। ইলিশের মোট দৈর্ঘ্যের মধ্যে ষ্টান্ডার্ড দৈর্ঘ্য ৮৪.২%; ফর্‌ক ৮৭.৮%; প্রিএনাল ৫৯.৮%; প্রি-ডরসাল ৩৬.১%; প্রি-পেলভিক ৩৭.৬%; প্রি-পেকটোরাল ২২.৪%; বডি ডেপথ্ ২৭.৫%; হেড ২২.০% এবং প্রি-অরবিটাল লেনথ ও আই ডায়ামিটার যথাক্রমে হেডলেন্থ এর ১৬.৯ ও ১৯.২%	৯। চন্দনা ইলিশের মোট দৈর্ঘ্যের মধ্যে ষ্টান্ডার্ড দৈর্ঘ্য ৮২.২%; ফর্‌ক ৮৬.০%; প্রি-এনাল ৬০.২%; প্রি-ডরসাল ৩৫.৫%; প্রি-পেলভিক ৩৯.৩%; প্রি-পেকটোরাল ২৩.৫%; বডিডেপথ ২৮.৯%; হেড ২৪.৪%; এবং প্রি-অরবিটাল লেনথ ও আই ডায়ামিটার যথাক্রমে হেড লেন্থ এর ২২.২ ও ২২.৯%	৯। কোন তথ্য নেই

T. ilisha (Ilish)

T. toli (Chandana ilish)

Hilsa kelee (Kanagurta)

৪. বাংলাদেশে ইলিশ মাছের বিস্তৃতি

বাংলাদেশে ইলিশ মাছের বিস্তৃতি ব্যাপক। একসময় দেশের প্রায় সকল প্রধান নদ-নদী এবং নদী সমূহের শাখা ও উপ-নদীতেও প্রচুর পরিমাণে ইলিশ মাছ পাওয়া যেত। বন্যা বা প্লাবনের বৎসরে নদীর সাথে সংযোগ আছে এমন সব বিল ও হাওড়েও ইলিশ মাছ কখনও কখনও পাওয়া যায়। বর্তমানে দেশের প্রায় ১০০টি নদ-নদীতে ইলিশ ও জাটকা পাওয়া যায় এবং প্রধান আহরণ এলাকা হচ্ছে মেঘনা নদীর নিম্নাঞ্চল, তেঁতুলিয়া, কালাবদর বা আড়িয়াল খাঁ (নিম্ন অংশ), ধর্মগঞ্জ, নয়াভাংগানি ইত্যাদি নদী এবং মোহনা ও বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় অঞ্চল। এ সকল এলাকায় প্রায় সারা বৎসর ইলিশ ধরা পড়ে। ইলিশের জন্য বিখ্যাত এক সময়ের পদ্মা, ধলেশ্বরী, গড়াই, চিত্রা, মধুমতি ইত্যাদি নদীতে বর্তমানে শুষ্ক মৌসুমে ইলিশ মাছ প্রায় পাওয়া যায়না বলা যেতে পারে।

৫. বাংলাদেশে ইলিশ উৎপাদনের গতিধারা

ইলিশ মাছ আহরণের পরিমাণ সম্পর্কে অতীতের সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। বিভিন্ন তথ্যপত্র অনুযায়ী পঞ্চাশের দশকে এ অঞ্চলে ইলিশ মাছের বার্ষিক গড় উৎপাদন ছিল ১.০-১.৫ লক্ষ মে.টন। ষাটের দশকের শুরুতে এ মাছের উৎপাদন হ্রাস পেয়ে আশির দশকে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে অর্থাৎ প্রায় ১.৫ লক্ষ মেঃ টনে উন্নীত হয়। বাংলাদেশে ১৯৮৩-৮৪ সাল হতে ইলিশ মাছের উৎপাদন মৎস্য অধিদপ্তরের ফিসারীজ রির্সোস সার্ভে সিস্টেম (FRSS) কর্তৃক ধারাবাহিক ভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। উক্ত সূত্রের তথ্য অনুযায়ী বিগত ১৯৮৩-৮৪ ও ২০০৬-০৭ সালে ইলিশ আহরণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে১.৪৬ ও ২.৮০ লক্ষ মে.টন। বিগত ১৯৮৩-৮৪ সালের তুলনায় বর্তমানে ইলিশের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। দেশের বিভিন্ন জলাশয় হতে ইলিশ আহরণের পরিমাণ সারণি-১ এবং উৎপাদনের ধারা চিত্র-১ এ দেখানো হলো।

সারণি-১ঃ বাংলাদেশে ইলিশ উৎপাদনের পরিমাণ

সন	উৎপাদনের পরিমাণ (মে.টন)			হ্রাস/বৃদ্ধি (%)
	অভ্যন্তরীণ	সামুদ্রিক	মোট	
১৯৮৩-৮৪	৯০,০৮২	৫৬,০০০	১৪৬,০৮২	০.০০
১৯৮৪-৮৫	৭৩,৩৮৮	৭১,০৫০	১৪৪,৪৩৮	-১.১৩
১৯৮৫-৮৬	৯৪,৭৯৭	৯৬,২৯৪	১৯১,০৯১	৩২.৩০
১৯৮৬-৮৭	৯১,১৬৭	১০৩,৮১৪	১৯৪,৯৮১	২.০৪
১৯৮৭-৮৮	৭৮,৫৫১	১০৪,৯৫০	১৮৩,৫০১	-৫.৮৯
১৯৮৮-৮৯	৮১,৬৪১	১১০,৩১১	১৯১,৯৫২	৪.৬১
১৯৮৯-৯০	১১২,৪০৮	১১৩,৯৪৩	২২৬,৩৫১	১৭.৯২
১৯৯০-৯১	৬৬,৮০৯	১১৫,৩৫৮	১৮২,১৬৭	-১৯.৫২
১৯৯১-৯২	৬৮,৩৫৬	১২০,১০৬	১৮৮,৪৬২	৩.৪৬
১৯৯২-৯৩	৭৪,৭১৫	১২৩,১১৫	১৯৭,৮৩০	৪.৯৭
১৯৯৩-৯৪	৭১,৩৭০	১২১,১৬১	১৯১,৫৩১	-২.৬৮
১৯৯৪-৯৫	৮৪,৪২০	১২৯,১১৫	২১৩,৫৩৫	১০.৯১
১৯৯৫-৯৬	৮০,৬২৫	১২৬,৬৬০	২০৭,২৮৫	-২.৯৩
১৯৯৬-৯৭	৮৩,২৩০	১৩১,২০৪	২১৪,৪৩৪	৩.৪৫
১৯৯৭-৯৮	৮১,৬৩৪	১২৪,১০৫	২০৫,৭৩৯	-৪.০৫
১৯৯৮-৯৯	৭৩,৮০৯	১৪০,৭১০	২১৪,৫১৯	৪.২৭
১৯৯৯-২০০০	৭৯,১৬৫	১৪০,৩৯৬	২১৯,৫৬১	২.৩৫
২০০০-০১	৭৫,০৬০	১৫৪,৬৫৪	২২৯,৭১৪	৪.৬২
২০০১-০২	৬৮,২৫০	১৫২,৩৪৩	২২০,৫৯৩	-৩.৯৭
২০০২-০৩	৬২,৯৪৪	১৩৬,০৮৮	১৯৯,০৩২	-৯.৭৭
২০০৩-০৪	৭১,০০০	১৮৪,৪৩৮	২৫৫,৮৩৯	২৩.১০
২০০৪-০৫	৭৭,৫০০	১৯৮,৩৬৩	২৭৫,৮৬০	১২.৬০
২০০৫-০৬	৭৮,২৭৩	১৯৮,৮৫০	২৭৭,১২৩	০.৪৬
২০০৬-০৭*	৮০,৪৫৩	১৯৯,৮৭৫	২৮০,৩২৮	১.২০

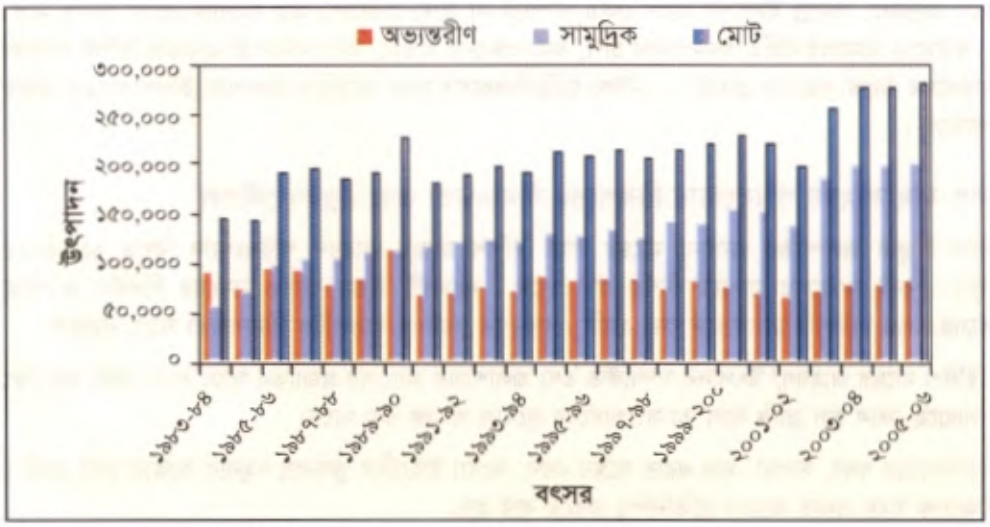

চিত্র-১ঃ বাংলাদেশে ইলিশ উৎপাদনের ধারা

অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ইলিশ উৎপাদনের ধারা

বিগত ১৯৮৩-৮৪ সালে দেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ইলিশ মাছের উৎপাদন ছিল প্রায় ০.৯০ লক্ষ মে. টন। উক্ত উৎপাদন হ্রাস পেয়ে ২০০৬-০৭ সালে মাত্র ০.৮০ লক্ষ মে. টনে দাঁড়িয়েছে (চিত্র-১)। বিগত ১৯৮৩-৮৪ সালের তুলনায় দেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ইলিশ মাছের উৎপাদন হ্রাসের পরিমাণ প্রায় ১২%, যা উদ্বেগজনক। অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে সর্বনিম্ন ০.৬৬ লক্ষ মে. টন ইলিশ পাওয়া যায় ১৯৯১ সালে। বর্তমানে দেশের মোট ইলিশ উৎপাদনে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের অবদান মাত্র ২৮%। কিন্তু অতীতে শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ ইলিশ মাছ পদ্মা ও মেঘনা নদী সহ দেশের বিভিন্ন নদ নদী হতে আহৃত হতো।

সামুদ্রিক জলাশয়ে ইলিশ উৎপাদনের ধারা

বর্তমানে সামুদ্রিক জলাশয় হতে আহৃত ইলিশ মাছের পরিমাণ ১৯৮৩-৮৪ সালের তুলনায় প্রায় ৪.০ গুণ (০.৫৬ ও ২.০০ লক্ষ মে.টন) বৃদ্ধি পেলেও (চিত্র-১) উহা কিছুটা উদ্বেগজনক। কারণ দেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ইলিশ মাছের উৎপাদন হ্রাস এবং সমুদ্র এলাকা হতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া ইলিশ মাছের সাগরের দিকে সরে যাওয়া নির্দেশ করছে। যদি এ মাছ আরও গভীর সাগরে সরে গিয়ে অর্থনৈতিক এলাকা বা সমুদ্র সীমানার বাইরে চলে যায় তবে এদেশের ইলিশ মাছ পার্শ্ববর্তী দেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ আহরণে নিয়োজিত হতে পারে। ফলে দেশে ইলিশ মাছের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এছাড়া ইলিশ মাছ সম্পূর্ণ সাগর নির্ভর হয়ে পড়লে তাদের প্রাকৃতিক প্রজননে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ইলিশ মাছের সহনশীল উৎপাদন ও ইলিশের পরিবেশ সংরক্ষণ করা অতীব জরুরী।

অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ইলিশ উৎপাদন হ্রাস এবং সামুদ্রিক জলাশয়ে বৃদ্ধির কারণ

অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পরিবেশগত পরিবর্তনের ফলে বিশেষ করে বিভিন্ন নদ-নদীতে বাঁধ ও ব্রীজের কারণে এবং উজান হতে পরিবাহিত পলি জমার জন্য পানি প্রবাহ ও নদ-নদীর নাব্য হ্রাস পাচ্ছে এবং জলজ পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়ছে। ফলে ইলিশ মাছের পরিভ্রমণ পথ, প্রজনন ক্ষেত্র, বিচরণ ও চারণ ক্ষেত্র দিন দিন পরিবর্তিত ও বিনষ্ট হচ্ছে এবং অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ইলিশ মাছের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। ইতোপূর্বে সমুদ্র হতে বিভিন্ন কারণে (যান্ত্রিক নৌকার অভাব, বরফ

পরিবহণে অসুবিধা, সমুদ্রে ইলিশের চারণ ক্ষেত্র সম্পর্কে না জানা ইত্যাদি) অল্প সংখ্যক জেলে ইলিশ মাছ আহরণ করত। বর্তমানে ক্রমাগত বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ, কর্মসংস্থানের অভাব, অতি কার্যকরী একতন্তু বিশিষ্ট ফাঁসজাল এবং মাছ আহরণের উন্নত পদ্ধতির প্রবর্তন ও নৌকা যান্ত্রিকীকরণের ফলে সামুদ্রিক জলাশয়ে ইলিশ মাছের আহরণ মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬. ইলিশ মাছ আহরণ পরিসংখ্যান নিরূপণের সীমাবদ্ধতা এবং উন্নয়ন কৌশল

অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ের অন্যান্য মাছের সাথে ইলিশ মাছের আহরণ পরিসংখ্যান বিগত ১৯৮৩-৮৪ সালে উন্নয়নকৃত একটি মডেলের মাধ্যমে নির্ণয় করা হচ্ছে। মডেলটি উত্তম হলেও সময়ের বিবর্তন ও পরিবেশগত পরিবর্তনের সাথে মডেলটি হালনাগাদ করা হয়নি। বর্তমানে প্রচলিত মডেলটির সীমাবদ্ধতা সমূহ নিম্নরূপ:

- ইলিশ মাছের আহরণ/ উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্য জলাশয়ের অন্য সব প্রজাতির সাথে সংগ্রহ করা হয়। ফলে তথ্য সংগ্রহে কোন ভুল ভ্রান্তি হলে তা সংশোধনের সুযোগ অত্যন্ত কম থাকে;
- জলাশয়ের ধরণ, সংখ্যা; মাছ ধরার যন্ত্রের ধরণ, সংখ্যা ইত্যাদির তুলনায় নমুনার আকার খুবই ছোট এবং তা অনেক সময় প্রকৃত তথ্যের প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যর্থ হয়;
- নদী এবং মোহনার Ecosystem এর পরিবর্তনের ফলে ইলিশ অবতরণের ধরণ পাল্টে গেছে-অথচ রিসোর্স সার্ভে সিস্টেম এর ফ্রেম আগেরটিই (১৯৮৩-৮৪ সালের) আছে। কিছু কিছু নমুনা গ্রাম নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। অনেক জেলে পেশা পরিবর্তন করেছে এবং কোথাও কোথাও নতুন জেলের উদ্ভব ঘটেছে। GEF কম্পোনেন্টের আওতায় ২০০২ সালে নমুনা নৌকা ও নমুনা গ্রামের উপর পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগে যথাক্রমেপ্রায় ৩৭.৫% এবং ৩৯.৬% জেলে গ্রাম আর নেই। অন্যদিকে চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগে যথাক্রমেপ্রায় ১২.৪% ও ৩৮.৭% জেলে নৌকা বৃদ্ধি পেয়েছে। জরিপকৃত ৬০ টি গ্রামের মধ্যে ৯টি গ্রামকে খুঁজেই পাওয়া যায়নি। এ প্রেক্ষাপটে জেলে গ্রাম ও নৌকার সংখ্যা হালনাগাদ করা অতীব জরুরী;
- প্রয়োজনীয় সংখ্যক নমুনা সংগ্রহের জন্য মৎস্য সম্পদ জরিপ শাখার জনবল ও লজিষ্টিক সাপোর্ট অত্যন্ত সীমিত। উপরোক্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য সারা দেশে ৬৩টি জরিপ কর্মকর্তার পদ থাকলেও ৮-১০টি পদ দীর্ঘদিন যাবত শূন্য আছে। মাঠ পর্যায় হতে নমুনা সংগ্রহের জন্য আর্থিক সাপোর্ট (T.A, D.A) অত্যন্ত কম। ফলে জরিপ কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ করতে পারেন না।

যে কোন সম্পদের সুষ্ঠু উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য উৎপাদনের সঠিক পরিসংখ্যান প্রয়োজন। ইলিশ মাছের জন্যও একই নিয়ম প্রযোজ্য। এ প্রেক্ষাপটে দেশে ইলিশ উৎপাদনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ইলিশ আহরণ পরিসংখ্যান জরুরীভাবে হালনাগাদ (update) করা প্রয়োজন।

বর্তমান পদ্ধতি উন্নয়নের কৌশল

- শুধুমাত্র ইলিশ মাছের উৎপাদন পরিবীক্ষণের জন্যএকটি মডেল তৈরী করা;
- নমুনা গ্রাম (Sample village) ও মাছ ধরার এককের সংখ্যা (Fishing unit) পূনঃ জরিপ করে প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ;
- নমুনার আকার প্রয়োজন অনুসারে বৃদ্ধি করা;
- মাঠ পর্যায়ে তদারকি ও পরিবীক্ষণ জোরদার করা যাতে সংগৃহীত তথ্য মান সম্পন্ন, সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হয়;
- মৎস্য সম্পদ জরিপ পদ্ধতির জন্য মাঠ পর্যায়ে লোকবল ও লজিষ্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধি;
- তথ্য সংগ্রহের কাজে জরিপ কর্মকর্তাদের সাথে উপজেলা মৎস্য দপ্তরকে সম্পৃক্ত করা এবং প্রতি উপজেলায় একজন মৎস্য সম্পদ জরীপ কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

৭. জালের ফাঁসের দৈর্ঘ্য (Mesh size) পরিমাপ পদ্ধতি

মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রায়শঃ জালের ফাঁসের আকার (Mesh size) পরিমাপ করার প্রয়োজন হয়। এ বিষয়ে সঠিক ধারণার অভাবে অনেক সময় বিভ্রান্তি দেখা দেয়। জালের ফাঁস সাধারণতঃ বর্গাকৃতির এবং ৪টি বাহু দ্বারা গঠিত হয়। একটি বাহু দ্বারা একটি ফাঁস তৈরী হয় না। কাজেই জালের ফাঁসের দৈর্ঘ্য কমপক্ষে দুইটি বাহুর দূরত্ব যাহা প্রকৃতপক্ষে তিনটি গিট এর দূরত্বের সমান বা ফাঁসটি টেনে সোজা করলে যে দূরত্ব পাওয়া যায়। নিম্নে জালের ফাঁসের চিত্র এবং পরিমাপের পদ্ধতি দেয়া হলো ঃ

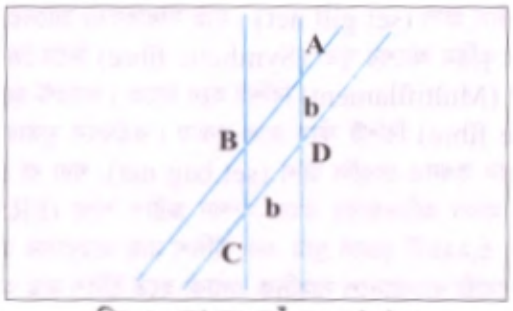

চিত্র-২ঃ জালের ফাঁসের আকার

উপরের চিত্রে AB, BC, CD এবং DA চারটি বাহু দিয়ে একটি জালের ফাঁস গঠিত হয়েছে। এ পর্যায়ে জালের ফাঁসের দৈর্ঘ্য হবে AB+BC অথবা AD+DC। জালের ফাঁসের A এবং C প্রান্ত অথবা B এবং D প্রান্ত ধরে টেনে লম্বা করলে একটি দৈর্ঘ্য পাওয়া যাবে যাহা AB+BC অথবা AD+CD এর সমান হবে। এ প্রেক্ষাপটে জালের ফাঁসের দৈর্ঘ্য হবে AC অথবা BD প্রান্তের সমান দূরত্ব বা b + b। এক্ষেত্রে b হচ্ছে দুইটি গিড়ার (গিট/গেট্রো) সমান দূরত্ব। যে কোন সাধারণ স্কেল ব্যবহার করে জালের একটি ফাঁস টেনে লম্বা করে ফাঁসের দৈর্ঘ্য সহজেই পরিমাপ করা যেতে পারে।

৮. ইলিশ মাছ ধরার প্রধান মৌসুম ও জাল, যন্ত্রপাতি

বাংলাদেশে প্রায় সারা বৎসর কমবেশী পরিমাণে এবং প্রায় সকল প্রধান নদ-নদী ও উপকূলীয় এলাকায় ইলিশ মাছ ধরা পড়ে। তবে ইলিশ মাছ ধরার প্রধান মৌসুম হচ্ছে প্রতি বৎসর আগষ্ট হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত (চিত্র-৩)।

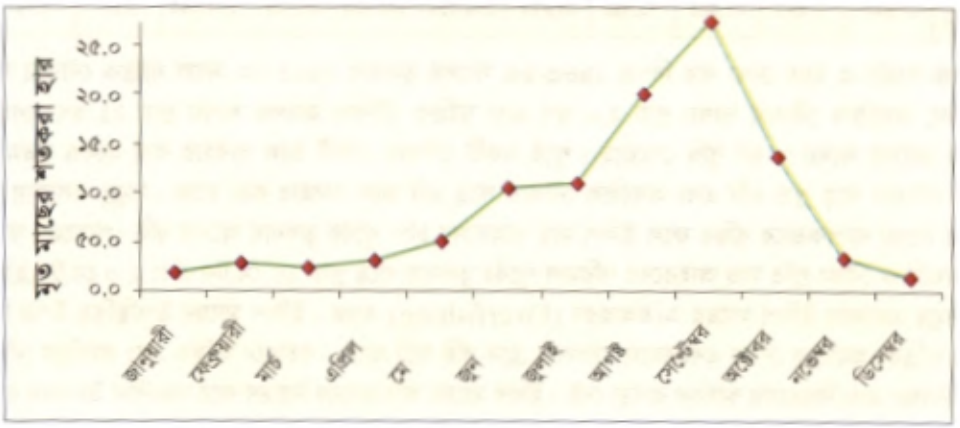

চিত্র-৩: বরিশালস্থ পদ্মাবতী পাইকারী বাজারে ১৯৮৫-২০০২ ইং সালে মাসওয়ারী ইলিশ অবতরণের শতকরা হার

এ সময় সর্বোচ্চ পরিমাণে (গড়ে প্রায় ৬০%) ইলিশ মাছ ধরা পড়ে। তাই ইলিশ মাছ ধরার প্রধান মৌসুম আগষ্ট হতে অক্টোবর মাস এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মৌসুম মে-জুলাই মাসকে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

ইলিশ মাছ ধরার এলাকা এবং মৌসুম ভেদে ব্যবহৃত জাল ও যন্ত্রপাতি (নৌকা) ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এ সকল জাল বিভিন্ন নামে পরিচিত। সাধারণতঃ কোনাজাল, গুলতি/গুল্লি জাল, টানা জাল, কারেন্ট জাল, বানা-বাঁধ ইত্যাদি ব্যবহার করে ইলিশ মাছ ধরা হয়। এ সকল জালের ফাঁসের আকার ৪.৫ সে.মি. হতে ১০.০-১৫.০ সে.মি. আকার পর্যন্ত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ইলিশ মাছ ধরার জন্য সবচেয়ে কার্যকর ও বহুল ব্যবহৃত জাল হচ্ছে ভাসমান টানা (Floating drift gill net) ও স্থাপনকৃত ফাঁস জাল (set gill net)। মাছ সাধারণতঃ জালের ফাঁসে আটকিয়ে অথবা জালের পকেটে ধরা হয়। অধিকাংশ জাল কৃত্রিম আঁশের সুতা (Synthetic fibre) দিয়ে তৈরী। জাল তৈরীর সুতা এক তন্তু (Monofilament) ও বহু তন্তু (Multifilament) বিশিষ্ট হয়ে থাকে। কারেন্ট জাল বলতে অত্যন্ত সুক্ষ্ম এক তন্তু (Monofilament synthetic fibre) বিশিষ্ট ফাঁস জাল বুঝায়। বর্তমানে সুতার জাল প্রায় ব্যবহার হয়না বলা চলে। উপরোক্ত জাল ছাড়াও কখন কখনও বেহুন্দি জাল (set bag net), খরা বা ভেসাল জালেও ইলিশ মাছ ধরা পড়ে। বিগত ১৯৮৩-৮৪ সালে মৎস্য অধিদপ্তরের মৎস্য সম্পদ জরীপ শাখা (FRSS) কর্তৃক পরিচালিত জরীপে দেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে প্রায় ৩,২২৮টি জেলে গ্রাম এবং ইলিশ মাছ আহরণের জন্য ৯৮,৫১৪টি নৌকা নিরূপণ করা হয়েছিল। উক্ত শাখার তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে সামুদ্রিক এলাকা হতে ইলিশ মাছ আহরণের জাল ও নৌকার সংখ্যা এবং একক প্রচেষ্টায় ধৃত মাছের পরিমাণ সারণি-২ এ দেয়া হলো।

সারণি-২ঃ সামুদ্রিক এলাকার যান্ত্রিক এবং অযান্ত্রিক নৌকার সংখ্যা ও একক প্রচেষ্টায় ধৃত ইলিশের পরিমাণ

সন	নৌকার সংখ্যা			জালের সংখ্যা			ধৃত ইলিশ (মে.টন)			গড় আহরণ/নৌকা/বছর		
	যা.নৌ.	অ.যা.নৌ.	মোট	যা.নৌ.	অ.যা.নৌ.	মোট	যা.নৌ.	অ.যা.নৌ.	মোট	যা.নৌ.	অ.যা.নৌ.	মোট
১৯৮৩/৮৪	৩,৩৪৭	০	৩,৩৪৭	৩,৩৪৭	০	৩,৩৪৭	৫৬,০০০	০	৫৬,০০০	১৬.৭৩	০	১৬.৭৩
১৯৮৫/৮৬	২,৮৮৭	৩,৮০২	৬,৬৮২	২,৮৮৭	৩,৮০২	৬,৬৮২	৮৮,৩৮৯	৭,৯০৫	৯৬,২৯৪	৩০.৬০	২.০৮	১৪.১৪
১৯৮৯/৯০	-ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	৯৫,২৮৫	১৮,৬৫৮	১১৩,৯৪৩	৩৩.১০	৫.৫২	১৭.৮০
১৯৯৪/৯৫	-ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	১১১,৪৭৫	১৭,৬৪০	১২৯,১১৫	৩৮.৭০	৫.০৩	২০.২০
১৯৯৮/৯৯	-ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	১২১,৯০৯	১৮,৭৬১	১৪০,৭১০	৪২.৩০	৫.৩৫	২২.০০
১৯৯৯/০০	১৮,৯৯২	৭,১৭৭	২৬,১৬৯	৭৫,৯৬৮	৪৪,৯২৩	১২০,৮৯১	১১৯,২৯৫	২১,০৭২	১৪০,৩৬৭	৬.৩০	২.৯৪	৫.৪০
২০০১/০২	১৮,৯৯২	৮,৩৭৭	২৫,৩৬৯	৭১,৭৬৮	৩৪,৫৪৮	১০৬,৩১৬	১৩১,৬১৯	২০,৭২৪	১৫২,৩৪৩	৬.৯৩	৩.২৪	৫.৯০

উপরোক্ত সারণি-২ হতে দেখা যায় বিগত ১৯৮৩-৮৪ সালের তুলনায় ২০০১-০২ সালে যান্ত্রিক নৌকার সংখ্যা প্রায় ৫.৭ গুণ, অযান্ত্রিক নৌকার সংখ্যা প্রায় ২.০ গুণ এবং যান্ত্রিক নৌকার জালের সংখ্যা প্রায় ২১ গুণ এবং অযান্ত্রিক নৌকার জালের সংখ্যা ৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বে একটি নৌকায় একটি জাল ব্যবহার করা হলেও বর্তমানে একটি যান্ত্রিক নৌকায় গড়ে প্রায় ৪টি এবং অযান্ত্রিক নৌকায় গড়ে ৬টি জাল ব্যবহার করা হচ্ছে। সমুদ্র এলাকায় জাল এবং নৌকার সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির ফলে ইলিশ মাছ আহরণের চাপ পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে যান্ত্রিক এবং অযান্ত্রিক নৌকা প্রতি মাছ আহরণের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় গড়ে প্রায় ১০ মে.টন এবং ২.০ মে.টন হ্রাস পেয়েছে এবং সমুদ্র এলাকায় ইলিশ মাছের অতিআহরণ (Overfishing) হচ্ছে। ইলিশ মাছের উপস্থিতির উপর নির্ভর করে প্রায়শঃ যান্ত্রিক, অযান্ত্রিক নৌকা এবং জালের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে। বর্তমানে যান্ত্রিক এবং অযান্ত্রিক নৌকা-জালের সংখ্যা নিবন্ধন এবং নিয়ন্ত্রণের কার্যকর ব্যবস্থা নেই। ইলিশ মাছের অতিআহরণ নিয়ন্ত্রণ করে সহনশীল উৎপাদন বজায় রাখার জন্য যান্ত্রিক এবং অযান্ত্রিক নৌকার সংখ্যা নিবন্ধন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করার কার্যকর ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন।

৯. ইলিশ মাছের জীববিদ্যা (Biology)

ইলিশ মাছের পরিভ্রমণ (Migration) ও জীবন চক্র (Life cycle)

ইলিশ মাছ সাধারণতঃ সমুদ্রের লবনাক্ত পানি হতে মিঠা পানিতে এবং মিঠা পানি হতে সমুদ্রে চলাচল করে থাকে। এ মাছের অটোলিথ গঠনের উপাদানের ক্ষুদ্র মৌলের বিন্যাস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সাগরের ইলিশ মিঠা পানিতে এবং মিঠা পানি হতে একই মাছ সাগরে পরিভ্রমণের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। সাধারণতঃ উপকূলীয় এলাকায় ইলিশ মাছের স্কুলিং হয়। মোহনা এলাকা হতে নদ-নদীর প্রায় ১২০০-১৩০০ কি.মি. উজানে এবং উপকূল হতে প্রায় ২৫০ কি.মি. দূরত্ব পর্যন্ত ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। গঙ্গা এবং কয়েকটি বড় নদীতে ইলিশ স্থায়ীভাবে বসবাস করে। ইলিশ মাছ অত্যন্ত দ্রুত সাঁতার কেটে থাকে। দিনে প্রায় ৭১ কি.মি. পর্যন্ত পরিভ্রমণ করতে পারে। বিভিন্ন পরিবেশে ইলিশ মাছের পরিভ্রমণ এবং জীবনচক্র নিম্নের চিত্র ৪-এ দেখানো হলো।

চিত্র-৪: ইলিশ মাছের পরিভ্রমণ ও জীবন চক্র

ইলিশ মাছের খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস

ইলিশ মাছ মূলতঃ প্লাঙ্কটন (Plankton) বা ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণীকণা ভোজী। ইলিশ মাছের গিল র‍্যাকার প্রায় চালুনির মত। তাই খাদ্যের তালিকায় বিশেষ কোন নৈর্বাচনিকতা (Selectivity) নেই। ইলিশ মাছের খাদ্য তালিকায় অ্যালজি-৪১.৬৫%, বালুকণা-৩৬.২৮%, ডায়াটম-১৫.৩৬, রটিফার-৩.১৯%, ক্রাষ্টাসিয়া-১.৮৯%, প্রোটোজোয়া-১.২২% এবং অন্যান্য মিশ্র দ্রব্যাদি-০.৪১% পাওয়া গিয়েছে। ইলিশ মাছের আকার, বয়স ও পরিবেশ ভেদে খাদ্য গ্রহণ মাত্রার তারতম্য হয়ে থাকে।

ইলিশ মাছের পরিপক্কতার আকার ও বয়স

ইলিশ মাছের গোনাডের হিষ্টোলজিকাল বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, সাধারণতঃ ১^{+} বৎসর বয়সে ইলিশ মাছ পরিপক্কতা লাভ করে। তবে আবহাওয়ার তারতম্য ও অন্যান্য কারণে অনেক সময় ৮-১০ মাস বয়সেও ইলিশ মাছ পরিপক্ক হতে পারে। পূর্বে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল ইলিশ মাছ সাধারণতঃ ২^{+} বৎসর বয়সে পরিপক্কতা লাভ করে। জিইএফ ও মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের যৌথ সমীক্ষায় সর্বনিম্ন ১৭ সে.মি. আকারের এবং ৪৩ গ্রাম ওজনের ইলিশ মাছে ডিম পাওয়া গিয়েছে (চিত্র-৫)। এ আকার এবং ওজনের পুরুষ ইলিশ মাছে মিল্ট বা বীর্য পাওয়া গিয়েছে। উপরের তথ্য হতে প্রমাণিত হয় ১ বৎসরের কম বয়সেও (৮-৯ মাসে) ইলিশ মাছ পরিপক্ক হতে পারে।

চিত্র-৫ঃ সর্বনিম্ন আকারের পরিপক্ক ইলিশ মাছ

পুরুষ-স্ত্রী ইলিশ মাছের অনুপাত (Sex ratio of hilsa)

পূর্বে অধিকাংশ বিজ্ঞানীর ধারণা ছিল পুরুষ এবং স্ত্রী ইলিশ মাছের আনুপাতিক হার ১ঃ১। সাম্প্রতিক কালের গবেষণায় এ ধারণাটি ভুল বলে প্রতীয়মান হয়েছে। স্থান, কাল, আকার ও প্রজাতি ভেদে পুরুষ-স্ত্রী ইলিশ মাছের আনুপাতিক হার ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। জিইএফ ষ্টাডিজের অধীনে সারা বৎসর ব্যাপী ১৮ সে.মি. হতে ৪৫ সে.মি. আকারের প্রায় ১৫,০০০ ইলিশ মাছ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সার্বিকভাবে পুরুষ-স্ত্রী ইলিশ মাছের আনুপাতিক হার ১ঃ২ পাওয়া গিয়েছে। জাটকা বা কিশোর বয়সে স্ত্রী-পুরুষ মাছের আনুপাতিক হার প্রায় সমান (১ঃ১) এবং এ হার ২৮-৩০ সে.মি. পর্যন্ত বলবৎ থাকে। অতঃপর স্ত্রী মাছের আনুপাতিক হার বৃদ্ধি পায় এবং ৪৪ সে.মি. এর উর্দ্ধ আকারের সকল মাছই স্ত্রী (চিত্র-৬)। ফলে সর্বোচ্চ আহরণ ও প্রজনন মৌসুমে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের মাছ ধরা পড়ে বিধায় এ সময় অধিকাংশই স্ত্রী বা ডিমওয়ালা মাছ পাওয়া যায়।

চন্দনা প্রজাতির (*T. toli*) ইলিশ মাছ লিঙ্গ পরিবর্তন করে পুরুষ মাছ স্ত্রী মাছে রূপান্তরিত হয়। এ প্রজাতির ১.০-২২.০ সে.মি. আকারের সকল মাছই পুরুষ, ২২.০ সে.মি. হতে ২৫-২৬ সে.মি. আকারের মাছে লিঙ্গ পরিবর্তন

ঘটে এবং ২৬ সে.মি. এর উর্দ্ধ আকারের সকল মাছই স্ত্রী। ইলিশা (*T. ilisha*) প্রজাতির মাছ লিঙ্গ পরিবর্তন করে কিনা এ বিষয়ে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

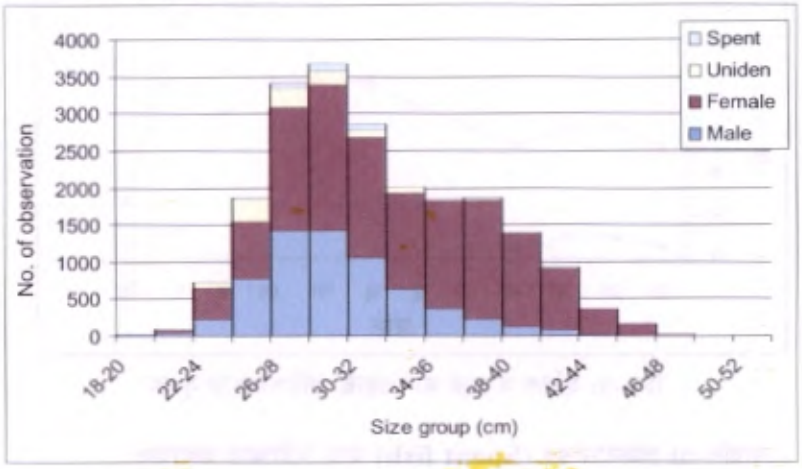

চিত্র-৬ঃ দৈর্ঘ্য অনুযায়ী পুরুষ-স্ত্রী ইলিশ মাছের অনুপাতিক হার

ইলিশের ডিম ধারণ ক্ষমতা (Fecundity)

ইলিশ মাছের বয়স ও আকারভেদে ডিম ধারণ ক্ষমতার তারতম্য হয়ে থাকে এবং দৈর্ঘ্য ও ওজনের সাথে ডিমের পরিমাণ সরাসরি (Directly) সম্পর্কযুক্ত। বড় মাছে বেশী ডিম এবং ছোট মাছে কম সংখ্যক ডিম থাকে। বাংলাদেশে পরিপক্ক ইলিশ মাছের ডিমের সংখ্যা ১.৫-২৩.০ লক্ষ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। দুই বছরের অধিক বয়সের ইলিশ সবচেয়ে বেশী ডিম ধারণ করে থাকে। বিগত ২০০৩ সালে ৪৪.৫ সে.মি. দৈর্ঘ্য এবং ১১০০ গ্রাম ওজনের একটি ইলিশ মাছে সর্বোচ্চ ২২,৮৬,০০০টি ডিম পাওয়া গিয়েছে। সিন্ধু নদের ইলিশ মাছে সর্বোচ্চ ২৯,১৭,০০০ পর্যন্ত ডিম ধারণ করার প্রতিবেদন আছে। এ প্রেক্ষাপটে প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ মাছ রক্ষা করা সম্ভব হলে প্রাকৃতিকভাবে সর্বোচ্চ পরিমাণে ইলিশের ডিম এবং পরবর্তীতে জাটকা হিসাবে পাওয়া যেতে পারে।

ইলিশ মাছের প্রজনন কাল ও সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুম

ইলিশ মাছ প্রায় সারা বৎসর কম-বেশী প্রজনন করে থাকে। তবে ইলিশ মাছের পরিপক্কতার সূচক (জি. এস.আই.) প্রজননক্ষম মাছের পরিমাণ এবং প্রজননোত্তর মাছ (Spent fish) পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দু'টি প্রধান যথা: অক্টোবর মাস সর্বোচ্চ এবং জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুম নিরূপণ করা হয়েছে (চিত্র-৭)। তবে অক্টোবর মাসের বড় পূর্ণিমার আগে এবং পরে ইলিশের ডিমের ব্যাস (Egg diameter) ও পরিপক্কতার মান সর্বোচ্চ পাওয়া গিয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে অন্যান্য কয়েকটি মাসে ইলিশ মাছের পরিপক্কতার সূচক উচ্চ মাত্রায় পাওয়া গেলেও এ সময় ডিমের ব্যাস সর্বোচ্চ পাওয়া যায়নি। কেবলমাত্র ডিমের ব্যাস সর্বোচ্চ হলেই আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে ইলিশ মাছ ডিম ছেড়ে থাকে। আমাদের দেশের জেলেদেরও ধারণা ইলিশ মাছ বড় পূর্ণিমার (দুর্গা পুঁজার পূর্ণিমা) সময়ই সবচেয়ে বেশী পরিমাণে ডিম ছাড়ে। আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে ইলিশ মাছের প্রজনন মৌসুম নভেম্বর/ডিসেম্বর মাস পর্যন্তও বর্দ্ধিত হতে পারে। জি.ই.এফ. ষ্টাডিজের (২০০৩) অধীনে নিম্ন মেঘনা অঞ্চলের প্রজননোত্তর মাছ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে (সারণি-৩) এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে।

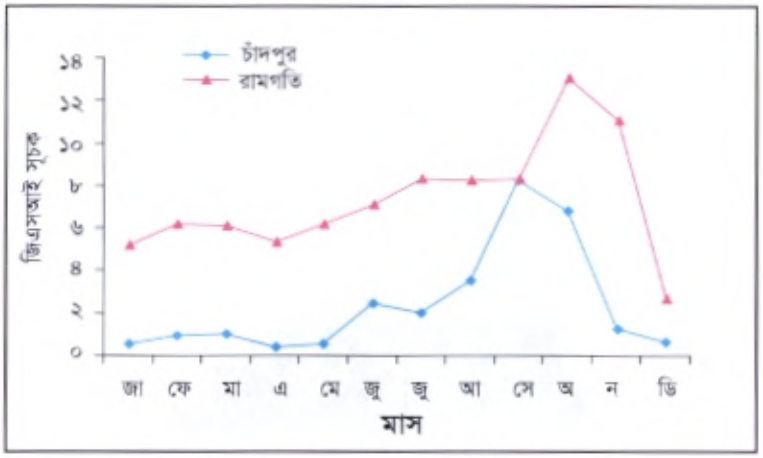

চিত্র-৭: ইলিশ মাছের মাসওয়ারী পরিপক্কতার সূচক

সারণি-৩ঃ প্রজননোত্তর (Spent fish) মাছ নিরীক্ষার ফলাফল

মাস	পর্যবেণকৃত মাছের সংখ্যা	প্রজননোত্তর মাছের সংখ্যা	প্রজননোত্তর মাছের শতকরা হার (%)
জানুয়ারী	৫২৮	৪	০.৭৬
ফেব্র"য়ারী	৫২২	১৪	২.৬৮
মার্চ	১,০৩৪	৭	০.৬৮
এপ্রিল	১,১৭৬	০	০.০০
মে	৫০৬	০	০.০০
জুন	১,০১২	০	০.০০
জুলাই	৫৭৯	০	০.০০
আগস্ট	৫২৫	০	০.০০
সেপ্টেম্বর	১,০০৬	০	০.০০
অক্টোবর	১,০১২	৩৭	৩.৬৬
নভেম্বর	৯৮২	১৯	১.৯৩
ডিসেম্বর	৮০৩	৩	০.৩৭
মোট =	৯,৬৮৫	৮৪	০.৮৭

প্রজননের সময় ও প্রজননের পৌনপুনিকতা (Spawning frequency)

ইলিশ মাছ একবারেই সকল ডিম ছাড়ে কিনা এ বিষয়ে কিছুটা দ্বিমত রয়েছে। বেশীর ভাগ বিজ্ঞানী মনে করেন যে ইলিশ মাছ তার ডিম্বকোষের সকল ডিম একবারে ছেড়ে দেয়না। এমনকি তাদের ডিম্বকোষের সকল ডিম একসাথে পরিপক্কও হয়না। তাই একই ইলিশ মাছ একাধিকবার ডিম ছাড়তে পারে বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু জি.ই.এফ ষ্টাডিজের অধীনে ইলিশ মাছের ডিম্ব কোষের সম্মুখভাগ এবং পশ্চাদভাগের ডিমের ব্যাস পরিমাপ করে কোন পার্থক্য পাওয়া যায়নি। এ প্রেক্ষাপটে বলা যায় ইলিশ মাছের সকল ডিম এক সাথেই পরিপক্ক হয় এবং একই সাথে ডিম ছেড়ে থাকে। তবে একটি ইলিশ বৎসরে কতবার ডিম ছাড়ে এ বিষয়ে এখনও সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ইলিশ মাছ সাধারণতঃ সন্ধ্যাকালীন সময়ে ডিম ছাড়ে। পানির তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে নিষিক্ত ডিম হতে রেনুপোনা পরিস্ফুটনের সময় নির্ভর করে। সাধারণতঃ ১২ হতে ২৪ ঘন্টা সময় লাগে।

১০. ইলিশ মাছের প্রধান প্রধান প্রজনন ক্ষেত্র ও ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

ইলিশ মাছ বাংলাদেশের প্রায় সকল প্রধান প্রধান নদ-নদী, মোহনা এবং উপকূলীয় এলাকায় ডিম ছেড়ে থাকে। তবে বিভিন্ন তথ্যের উপর নির্ভর করে মেঘনা নদীর ঢলচর, মনপুরা দ্বীপ, মৌলভীর চর ও কালির চর এলাকাকে ইলিশের প্রধান ৪টি প্রজনন ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সকল এলাকায় সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে পরিপক্ক ও ডিম নির্গত অবস্থার মাছ সমুদ্র থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে অমাবশ্যা ও পূর্ণিমার জোয়ারের সময় প্রবেশ করে। অন্যান্য সময় এখানে ইলিশ মাছের এত ব্যাপক উপস্থিতি দেখা যায় না। জেলেদের হাতে এ সময় প্রচুর পরিমাণে ডিম নির্গত অবস্থার ইলিশ মাছ ধরা পড়ে এবং পানি খুব ঘোলাটে ও প্রবল জোয়ার-ভাটা থাকে। উক্ত ৪ (চার)টি প্রধান প্রজনন ক্ষেত্রের ব্যাপ্তি, ভৌগলিক অবস্থান চিত্র-৮ এ দেখানো হলো।

- ঢলচর দ্বীপ (চর ফ্যাশন, ভোলা জেলা) প্রায় ১২৫ বর্গ কি.মি. এলাকা (GPS reading ২১° ৪২-২১° ৫৫ N এবং ৯০° ২০, ৯০° ৫৩- ৯০° ৫০ E)
- মনপুরা দ্বীপ (মনপুরা, ভোলা জেলা) সংলগ্ন প্রায় ৮০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা (GPS reading ৯১° ১২-৯১°-২০ E এবং ২২° ০০-২২°-১৫ N)
- মৌলভীর চর দ্বীপ (হাতিয়া উপজেলা, নোয়াখালী) সংলগ্ন প্রায় ১২০ বর্গ কি.মি. এলাকা (GPS reading ২১° ৫৩-১২° ০৩ N এবং ৯১° ১৭-৯১° ২৭ E)
- কালিরচর দ্বীপ (সন্দীপ উপজেলা, চট্টগ্রাম) সংলগ্ন প্রায় ১৯৪ বর্গ কিলোমিটার এলাকা

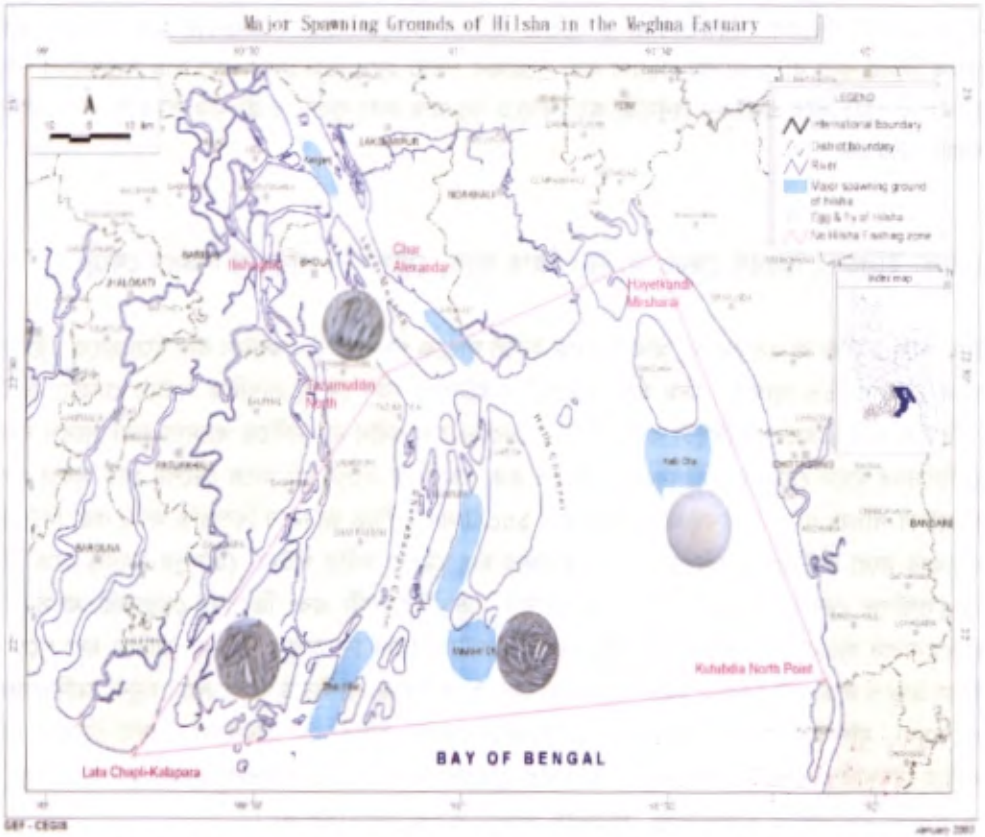

চিত্র-৮ ঃ ইলিশ মাছের প্রধান প্রধান প্রজনন ক্ষেত্র ও ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ এলাকা

ইলিশ সম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রজনন ক্ষেত্র ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

মৎস্য কূলের (Fish population) বংশ বৃদ্ধি, সফল প্রজনন ও পোনা মাছ সংরক্ষণের মাধ্যমেই ঘটে থাকে। যদি কোন মৎস্য কূল সফলভাবে প্রজনন এবং প্রজননের পরে পোনা মাছ বড় হওয়ার সুযোগ না পায় তবে ঐ মৎস্য কূল অচিরেই যে কোন এলাকা হতে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তাই নিম্নোক্ত কারণে ইলিশ মাছের প্রজনন ক্ষেত্র ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনঃ

- সফল ভাবে ইলিশ মাছের প্রজনন সুবিধা সৃষ্টি করা;
- প্রজনন এলাকায় প্রজননক্ষম মাছ সীমিতভাবে আহরণ বা বন্ধ রাখা;
- অধিক প্রজননশীল মাছ এবং উচ্চ মাত্রায় ডিম দেয় এরূপ মাছ রক্ষা করা;
- সফলভাবে ডিম নিষিক্তের জন্য পুরুষ ও স্ত্রী মাছের সমতা রক্ষা করা।

ইলিশ মাছ ধরার জাল-নৌকার সংখ্যা পর্যালোচনা এবং মজুদ নিরূপন বিষয়ক অধ্যায়ে দেখা যায় যে বাংলাদেশে এ মাছের অতিআহরণ হচ্ছে। কাজেই এ মাছের নতুন প্রজননের মাছের পুনঃসংযোগ প্রক্রিয়া(Recruitment) অব্যাহত রাখার জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রজনন ও প্রজনন এলাকার পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখার প্রয়োজন। এলক্ষ্যে এ মাছের নিরবচ্ছিন্ন প্রজনন ও প্রজনন পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে প্রজনন এলাকায় মাছ আহরণ আংশিক বা সম্পূর্নভাবে নিষিদ্ধ করা বা অভয়াশ্রম ঘোষণা করা প্রয়োজন। উচ্চ হারে ডিম দেয় এরূপ মাছ সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট ফাঁসের জাল ব্যবহার করে প্রয়োজন অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত বড় মাছ এবং পুরুষ ও স্ত্রী-মাছ সমহারে রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করাও প্রয়োজন।

১১. জাটকা ইলিশের বিচরণ ক্ষেত্র, জাটকা ধরার জাল, মৌসুম ও পরিমাণ বিচরণ ক্ষেত্র

আমাদের দেশে ৯ ইঞ্চি বা ২৩ সে.মি. আকার পর্যন্ত ইলিশ মাছকে প্রচলিতভাবে জাটকা বলা হয়ে থাকে। ইলিশ মাছের মত জাটকার বিস্তৃতিও ব্যাপক। ডিম হতে পরিস্ফুটিত ইলিশের রেণু পোনা প্রাথমিক পর্যায়ে মোহনা ও উপকূলীয় অঞ্চলে বিচরণ করে। অত:পর কিছুটা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে দেশের অভ্যন্তরীণ নদ-নদীতে খাদ্যের জন্য প্রবেশ করে। তাই নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে মোহনা ও উপকূলীয় অঞ্চলে এবং জানুয়ারী-এপ্রিল/মে মাসে দেশের প্রায় সকল প্রধান নদ-নদীতে জাটকা পাওয়া যায়। দেশের অভ্যন্তরীণ প্রায় ১০০টি নদ-নদীতে জাটকার বিস্তৃতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। তবে উক্ত এলাকার মধ্যে জাটকার চারটি প্রধান বিচরণ ক্ষেত্র যথা মেঘনা নদীর ষাটনল (চাঁদপুর জেলা) হতে নীলকমল-রামগতি (লক্ষীপুর জেলা) অংশে, শাহবাজপুর চ্যানেল, তেঁতুলিয়া নদী এবং ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারী মাসে পটুয়াখালী জেলার রাবনাবাদ চ্যানেল, আন্দারমানিক নদী এবং কুয়াকাটা দুবলার চর অংশে সর্বাধিক জাটকা ধরা পড়ে। মেঘনা অববাহিকা ছাড়াও রাজশাহী জেলার মহানন্দা ও পদ্মা নদীতে, গাইবান্ধা ও সিরাজগঞ্জ জেলার যমুনা, মানিকগঞ্জ জেলার পদ্মা ও যমুনা, মুন্সিগঞ্জ জেলার পদ্মা, বরিশালের কীর্তনখোলা, ইলিশা ও কারখানা, ভোলা জেলার তেতুলিয়া, পটুয়াখালীর বিষখালী, পায়রা ও আগুনমুখা, বরগুনার বুড়িশ্বর, বাগেরহাটের বলেশ্বর, খুলনা জেলার রূপসা, শিবসা, পশুর ও অন্যান্য নদ-নদীতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে জাটকা পাওয়া যায় (চিত্র-৯)।

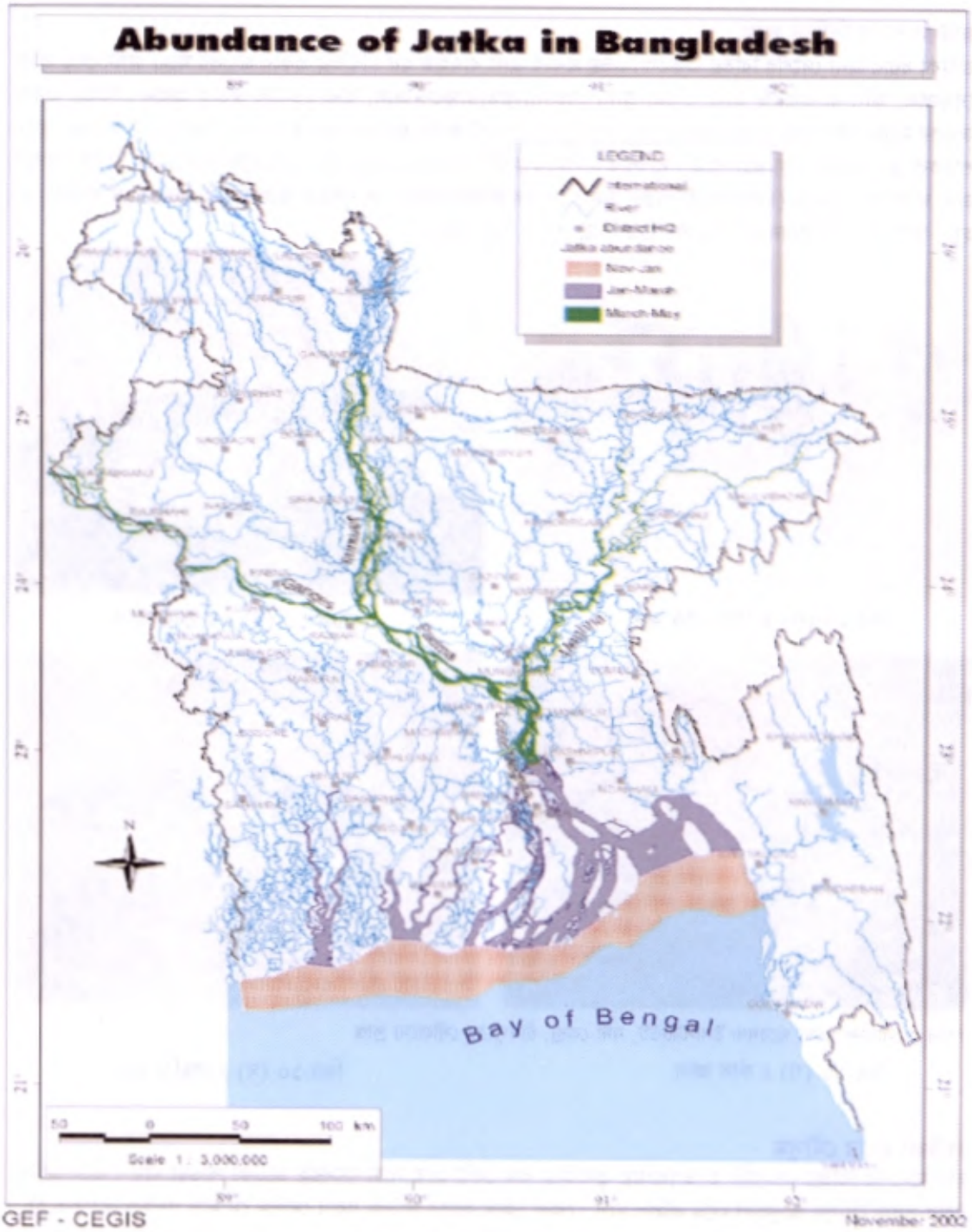

চিত্র-৯: বাংলাদেশে জাটকা ইলিশের বিচরণ ক্ষেত্র

জাটকা ধরার বিভিন্ন জাল

জাটকা ধরার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার জাল ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন প্রকার জালের মধ্যে জগৎ বেড় জাল, বেড়জাল, ফাঁস বা কারেন্ট জাল, পোয়া জাল, বেহুন্দী/সুতি/রাক্ষুসে জাল, বানা ভেসাল প্রভৃতি প্রধান। বিভিন্ন প্রকার জালের মধ্যে জগৎ বেড় জালে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ, কারেন্ট জালে শতকরা ৪০ ভাগ এবং বেহুন্দী সহ অন্যান্য জালে শতকরা ১০ ভাগ জাটকা ধরা পড়ে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রবর্তিত (Introduced) জোয়ারের সময় ডুবন্ত চরের চারপাশ জাল দ্বারা ঘেরাও করে (চরঘেরা/খুঁটি/খরচা জাল) দেশের দক্ষিণাঞ্চলের নদ-নদীতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে জাটকা ধরা হয়। জাটকা ধরার প্রধান ৪টি জালের চিত্র নিম্নে প্রদান করা হলোঃ-

চিত্র-১০ (ক) ঃ জগৎ বেড় জাল

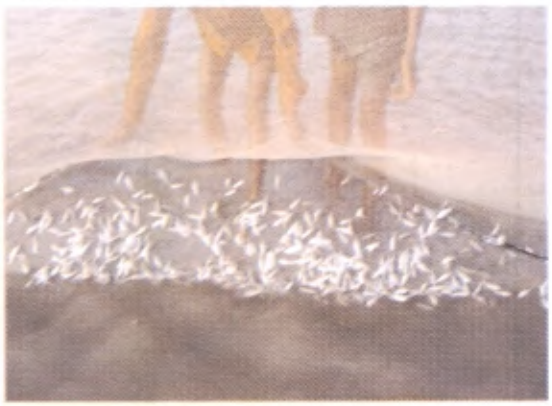

চিত্র-১০ (খ) ঃ চরঘেরা জাল

চিত্র-১০ (গ) ঃ ফাঁস জাল

চিত্র-১০ (ঘ) ঃ বেহুন্দি জাল

*ছবি বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুরের সৌজন্যে প্রাপ্ত

জাটকা ধরার মৌসুম

বাংলাদেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও উপকূলীয় এলাকায় কম বেশী প্রায় সারা বৎসরই জাটকা পাওয়া যায়। তবে জাটকা ধরার প্রধান মৌসুম জানুয়ারী হতে এপ্রিল মাস। কোন কোন বৎসর জাটকা ধরার মৌসুম মে মাস পর্যন্তও বিস্তৃত হয়। সাধারণতঃ এপ্রিল-মে মাসে বৃষ্টিপাত ও অন্যান্য কারণে নদীর পানি ঘোলা হওয়ার পর আর তেমন জাটকা পাওয়া যায় না। জাটকার আধিক্য ইলিশ মাছের প্রধান প্রজনন মৌসুমের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। সাধারণতঃ অক্টোবর মাসে প্রজননকৃত

ইলিশ মাছের ডিম হতে পরিস্ফুটিত রেণু-পোনা নভেম্বর-ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে উপকূলীয় এলাকায় বিচরণ করে। এ সময় উপকূলীয় এলাকায় ব্যবহৃত বেহুন্দি জাল, চর ঘেরাও জাল, বেড় জালে প্রচুর পরিমাণে ধরা পড়ে। অতঃপর কিছুটা বড় হলে জাটকা নদীর উজানে অভিপ্রয়াণ করে এবং ২´-৩´ আকারের হলে জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাস হতে এপ্রিল-মে মাস পর্যন্ত বিভিন্ন নদ-নদীতে প্রচুর পরিমাণে ধরা পড়ে। বাংলাদেশে মাসওয়ারী ধৃত জাটকার পরিমাণ চিত্র-১১ এ দেখানো হলোঃ-

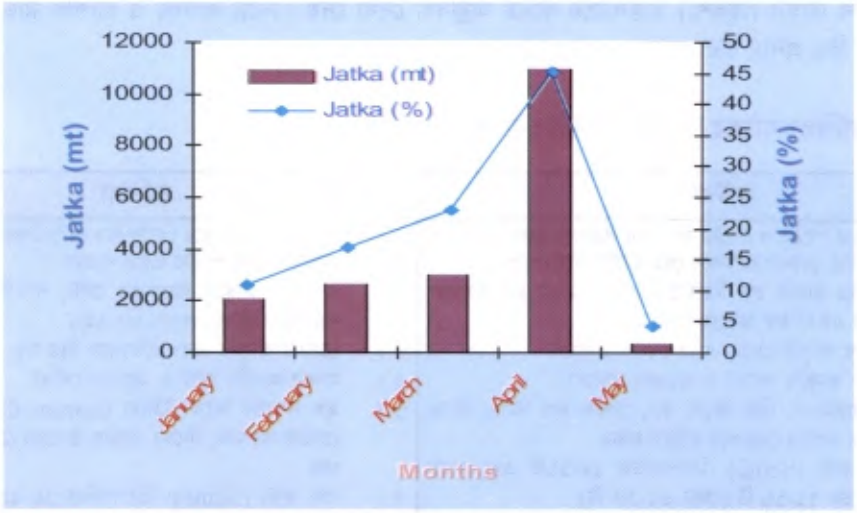

চিত্র-১১: বাংলাদেশে মাসওয়ারী জাটকা নিধনের পরিমাণ (১৯৯২-৯৪)

উপরের চিত্র হতে দেখা যায় বাংলাদেশে মোট ধৃত জাটকার প্রায় ৪০-৪৫% এপ্রিল মাসে এবং ১০-১৫% মার্চ মাসে অর্থাৎ মোট ধৃত জাটকার ৫০-৬০ ভাগ এ দুই মাসে ধরা পড়ে। অপর দিকে উপকূলীয় এলাকায় জাটকা মাছের প্রাধান্য নভেম্বর হতে জানুয়ারী মাস পর্যন্ত থাকে এবং জানুয়ারী মাসেই সবচেয়ে বেশী পরিমাণে ধরা পড়ে।

জাটকা ধরার পরিমাণ

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী বিগত ২০০০ সালে প্রায় ১৯,৩০০ মে.টন জাটকা ধরা হয়েছিল। দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও উপকূলীয় এলাকার মধ্যে প্রায় ৯৫% জাটকা নিম্ন মেঘনা হতে, ২.৭৫% উর্ধ ও নিম্ন পদ্মা নদীতে, প্রায় ১.০৫% খুলনা অঞ্চল হতে এবং অবশিষ্ট পরিমাণ বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন নদ-নদীতে ধরা পড়ে। পূর্বে এত ব্যাপক পরিমাণ জাটকা ধরার ফলে ইলিশ মাছের পুন:সংযোগ বা প্রবেশন প্রক্রিয়া এবং এ মাছের Growth over-fishing হচ্ছিল। ফলে ইলিশের বর্ধিত উৎপাদন পাওয়া যাচ্ছিল না। ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জাটকা নিধন বন্ধ করা জরুরীভাবে আবশ্যক। বর্তমানে জাটকা রক্ষা কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে দেশে জাটকা নিধন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। তবে বাণিজ্যিকভাবে আহৃত ইলিশ মাছের সাথে টেম্পু বা জাটকা আকারের ইলিশ (১৬-২৩ সে.মি.) মাছ ধরা পড়ছে যার পরিমাণ প্রায় ১০,০০০-১২,০০০ মে.টন/বৎসর। কাজেই ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সারা বৎসর জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ করার আইন প্রচলন করা প্রয়োজন।

১২. জাটকা ও চাপিলা মাছের পার্থক্য নির্ণয়

চাপিলা মাছ Clupeiformes বর্গের Clupeidae পরিবারের *Gudusia* এবং *Gonialosa* গণভূক্ত মাছ। অপর দিকে ইলিশ বা জাটকা মাছ Clupeiformes বর্গের Clupeidae পরিবারভুক্ত *Tenualosa* গণের মাছ। অর্থাৎ চাপিলা ও জাটকা মাছ দুইটি পৃথক গণের মাছ। সাধারণভাবে জাটকা ও চাপিলা মাছ দেখতে প্রায় একই রকম হওয়ায় মাঠ পর্যায়ে উভয় প্রকার মাছের পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক সময় জেলে এবং মাছ ব্যবসায়ীগণ জাটকা মাছকে চাপিলা বলে সকলকে বিভ্রান্ত করে থাকে। জাটকা ও চাপিলা মাছের পার্থক্য সনাক্তকরণে দক্ষতা না থাকলে মৎস্য সংরক্ষণ আইন (হিলশা) বাস্তবায়নে যথেষ্ট অসুবিধা দেখা দেয়। নিম্নে জাটকা ও চাপিলা মাছ সনাক্তকরণের বৈশিষ্ট্য এবং চিত্র প্রদান করা হলোঃ

জাটকা ও চাপিলা মাছের পার্থক্য নির্ণয়ের বৈশিষ্ট্য

জাটকা	চাপিলা
১। জাটকার পিঠের ও পেটের দিক প্রায় সমভাবে উত্তল	১। চাপিলার পিঠের চেয়ে পেটের দিক বেশী উত্তল ও প্রশস্থ
২। চাপিলার তুলনায় জাটকার দেহ পার্শ্বীয় ভাবে পুরু	২। চাপিলার দেহ পার্শ্বীয় ভাবে পাতলা
৩। আঁইশের আকৃতি বড়, নিয়মিত সারিতে সাজানো এবং পার্শ্বরেখা বরাবর এক সারিতে আঁইশের সংখ্যা ৪০-৫০	৩। আঁইশের আকৃতি অপোকৃত ছোট, পার্শ্বরেখা বরাবর এক সারিতে আঁইশের সংখ্যা ৮০-১২০
৪। চোখের আকৃতি ছোট, এডিপোজ লিড থাকে	৪। চোখের আকৃতি এবং এডিপোজ লিড বড়
৫। মাথার আকৃতি লম্বাটে ও অগ্রভাগ সূচালো	৫। মাথার আকৃতি ছোট ও অগ্রভাগ ভোঁতা
৬। মুখ টারমিনাল, ঠোঁট কিছুটা পুরু, চোয়াল প্রায় সমান, নিচের চোয়াল উপরের চোয়ালকে ছাড়িয়ে যায়না	৬। মুখ উপরের দিকে উঠানো (upturned), ঠোঁট পাতলা, চোয়াল অসমান, নিচের চোয়াল উপরের চোয়ালকে ছাড়িয়ে যায়
৭। বক্ষ কাটা (Scute): প্রিপেলভিক ১৫-১৬টি এবং পোষ্ট পেলভিক ১১-১৬ টি (মোট ৩০-৩৩ টি)	৭। বক্ষ কাটা (Scute): প্রিপেলভিক ১৮-১৯ টি এবং পোষ্ট পেলভিক ৮-১০ টি (মোট ২৬-২৯ টি)
৮। পৃষ্ট পাখনা ব পাখনার সামান্য সম্মুখে থাকে এবং ১১-১৬ টি শাখাযুক্ত (branched) রে (rays) থাকে	৮। পৃষ্ট পাখনা বক্ষ পাখনার সোজাসুজি উপড়ে থাকে এবং ১৬ টি শাখা যুক্ত রে থাকে
৯। পায়ু পাখনায় ১৪-২৪ টি শাখা যুক্ত রে থাকে	৯। পায়ু পাখনায় ২১-২৪ টি শাখা যুক্ত রে থাকে
১০। গিল ওপেনিং এর পরে একটি বড় কালো ফোটা এবং পরে অনেকগুলো ফোটা থাকে	১০। চাপিলা মাছেও অনেক সময় জাটকার অনুরূপ ফোটা থাকে, অনেক সময় থাকে না
১১। তাজা (Fresh) জাটকার গন্ধ ইলিশ মাছের গন্ধের মত	১১। চাপিলার গন্ধ ইলিশ মাছের মত নয়
১২। জাটকা রান্না করার সময় বা রান্নার পরে ইলিশ মাছের গন্ধ পাওয়া যায়	১২। চাপিলা রান্না করার সময় বা রান্না করার পরে ইলিশ মাছের গন্ধ পাওয়া যায় না
১৩। জাটকা বা ইলিশের মোট দৈর্ঘ্যের মধ্যে ষ্টান্ডার্ড দৈর্ঘ্য ৮৪.২%; ফরক ৮৭.৮%; প্রিএনাল ৫৯.৮%; প্রি-ডরসাল ৩৬.১%; প্রি-পেলভিক ৩৭.৬%; প্রি-পেকটোরাল ২২.৪%; বডি ডেপথ্ ২৭.৫%; হেড ২২.০% এবং প্রি-অরবিটাল লেনথ ও আই ডায়ামিটার যথাক্রমে হেডলেনথ এর ১৬.৯ ও ১৯.২%	১৩। চাপিলা মাছের মোট দৈর্ঘ্যের মধ্যে ষ্টান্ডার্ড দৈর্ঘ্য ৭৯.৭%; ফর্ক ৮৬.২%; প্রি-এনাল ৫৫.৫%; প্রি-ডরসাল ৩৮.০%; প্রি-পেলভিক ৩৭.৫%; প্রি-পেকটোরাল ১৯.৬%; বডি ডেপথ্-২৭.৭%; হেড ২১.৯% এবং আই ডায়ামিটার ও প্রি-অরবিটাল লেনথ হেডলেনথ এর যথাক্রমে ২৮.০ ও ১৭.৬%

জাটকা মাছের ছবি

চাপিলা মাছের ছবি

১৩. ইলিশ মাছের বয়স, দৈর্ঘ্য ও ওজন বৃদ্ধির হার এবং দেশে আহৃত মাছের গড় দৈর্ঘ্য ও ওজন

বয়স বলতে কোন প্রাণী জীবন্ত অবস্থায় যে সময় অতিক্রম করে এবং বৃদ্ধি বলতে কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন প্রাণীর দৈর্ঘ্য বা ওজন বাড়াকে বুঝায়। মাছের বয়স সাধারণতঃ তাদের আঁইশের এবং অটোলিথের বাৎসরিক রিং গণনা করে নির্ণয় করা যায়। কিন্তু ইলিশ মাছের আঁইশে বাৎসরিক রিং দেখা যায়না। তবে অটোলিথে প্রতি দিনের বৃদ্ধির জন্য রিং হয় এবং এসকল রিং গণনা করে এ মাছের বয়স নির্ণয় করা যায়। এছাড়া ভিন্ন ভিন্ন আকারের মাছের দৈর্ঘ্যের ঘটন বা উপস্থিতির সংখ্যা (Length-Frequency) ভন বারটালানফির (von Bertalanffy's) বৃদ্ধির সমীকরণ ELEFAN-I Model ব্যবহার করেও নির্ণয় করা যায়। উক্ত সমীকরণ ব্যবহার করে চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পের GEF Component এর অধীনে ইলিশ মাছের বয়স এবং বৃদ্ধির হার নির্ণয় করা হয়েছে (চিত্র-১২)।

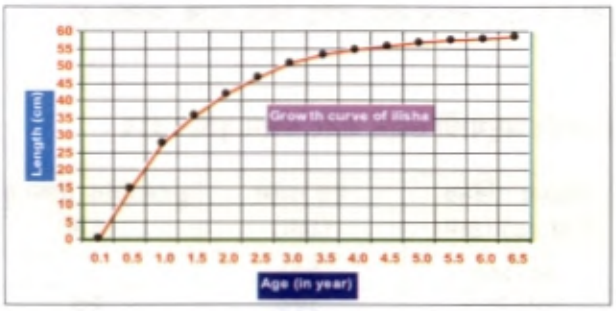

চিত্র-১২ঃ বয়স অনুযায়ী ইলিশ মাছের বৃদ্ধির (দৈর্ঘ্য) ধারা

ইলিশ মাছের বয়স ও বৃদ্ধির হার পর্যালোচনা করে দেখা যায় অন্যান্য মেরুদন্ডী প্রাণীর ন্যায় কম বয়সে ইলিশ মাছ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায় এবং তাদের বয়স ৩ বৎসর পূরণ হওয়ার পর বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে পরবর্তীতে শূন্য পর্যায়ে উপনীত হয়। বিভিন্ন বয়সে ইলিশ মাছের বৃদ্ধির হার সারণি-৪ এ দেয়া হলো।

সারণি-৪ঃ বয়স অনুসারে ইলিশ মাছের দৈর্ঘ্য এবং মাসিক বৃদ্ধির হার

বয়স (বৎসর)	দৈর্ঘ্য (সে.মি.)	বৃদ্ধির পরিমাণ/মাস (সে.মি.)	তুলনামূলক বৃদ্ধির পরিমাণ/মাস (সে.মি.)
০.৫	১৫-১৬	২.৬	-
১.০	২৭-২৮	২.৩	২.০
১.৫	৩৬-৩৭	২.০	১.৫
২.০	৪২-৪৩	১.৮	১.০
২.৫	৪৭-৪৮	১.৬	০.৮
৩.০	৫১-৫২	১.৪	০.৭
৩.৫	৫৩-৫৪	১.৩	০.৩
৪.৫	৫৫-৫৬	১.০	০.২
৫.০	৫৬-৫৬.৫	০.৯	০.১৩
৫.৫	৫৬.৫-৫৭	০.৮	০.০৮
৬.০	৫৭-৫৭.২৫	০.৭	০.০৮
৬.৫	৫৭.২৫-৫৮.০	০.৬	০.০১

উপরের সারণি হতে দেখা যায় ইলিশ মাছ ১ বৎসর বয়সে গড়ে প্রায় ২.৩ হতে ২.৬ সে.মি., ২ বৎসর বয়সে প্রায় ১.৮ হতে ২.০ সে.মি. এবং ৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত গড়ে প্রায় ০.৭৫ সে.মি. প্রতি মাসে বৃদ্ধি পায়। ইলিশ মাছের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ৫৭-৫৮ সে.মি. পৌছাতে প্রায় ৫-৬ বৎসর সময় লাগে। এ মাছের বয়স ৩ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর তুলনামূলক বৃদ্ধির হার দ্রুত হ্রাস প্রায় এবং পরবর্তী সময়ে তেমন বৃদ্ধি পায় না। এ মাছের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্যে পৌছাতে ৫-৬ বৎসর লাগে বলে এদের আয়ু ৫-৬ বৎসর বা মধ্যম আয়ুর মাছ বলা যেতে পারে। একই ইলিশ মাছ একাধিকবার সমুদ্র হতে নদ-নদীতে আসে বিধায় দ্রুত বর্ধনশীল ছোট মাছ ধরা বন্ধ করা হলে প্রাকৃতিকভাবে এ মাছের উচ্চ উৎপাদন পাওয়া যেতে পারে।

ইলিশ মাছের ওজন বৃদ্ধির হার

ইলিশ মাছ অল্প বয়সে দৈর্ঘ্যে দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও তুলনামূলক ওজন বৃদ্ধি সামান্য বিলম্বে বা বেশী বয়সে ঘটে এবং এ হার ৪০-৪৫ সে.মি. দৈর্ঘ্য বা ২.৫-৩.০ বৎসর বয়স পর্যন্ত বজায় থাকে (সারণি-৫)।

সারণি-৫ঃ ইলিশ মাছের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী ওজন এবং ওজন বৃদ্ধির হার

দৈর্ঘ্য (সে.মি.)	ওজনের পরিসর (Range) (গ্রাম)	গড় ওজন (গ্রাম)	তুলনামূলক ওজন বৃদ্ধি (গ্রাম)	তুলনামূলক ওজন বৃদ্ধির হার (%)
১৮-১৯	৯০-১৪০	১৩০	-	-
২০-২১	১০০-২০০	১৫০	২০	১৫
২২-২৩	১১০-২৪০	১৮০	৩০	২০
২৪-২৫	১১৫-৩৮০	২১০	৩০	১৭
২৬-২৭	১৫০-৪০০	২৪০	৩০	১৪
২৮-২৯	১৬৫-৪২০	২৭৫	৩৫	১৫
৩০-৩১	২০০-৪৫০	৩৭০	৯৫	৩৫
৩২-৩৩	২২০-৭০০	৪৪০	৭০	১৯
৩৪-৩৫	৩৫০-৭৫০	৫৩০	৯০	২০
৩৬-৩৭	৪২০-৯৮০	৬৭০	১৪০	২৬
৩৮-৩৯	৪৫০-১০০০	৮২০	১৫০	২২
৪০-৪১	৬০০-১২০০	৯৫০	১৩০	১৬
৪২-৪৩	৭০০-১৩৫০	১০৯০	১৪০	১৫
৪৪-৪৫	১০০০-১৫০০	১২২৫	১৩৫	১২

উপরের সারণি হতে দেখা যায় ৩০-৩৬ সে.মি. আকারের ইলিশ মাছে সর্বোচ্চ হারে (৩৫%) ওজন বৃদ্ধি পায়। এ আকারের মাছের গড় ওজন ২০০-৪৫০ গ্রাম পর্যন্ত থাকে। কাজেই সর্বোচ্চ উৎপাদন পাওয়ার জন্য কমপক্ষে ৩০-৩১ সে.মি. আকারের ইলিশ আহরণ বন্ধ করে প্রাকৃতিকভাবে প্রতিপালন করা প্রয়োজন।

দেশে আহৃত ইলিশ মাছের গড় দৈর্ঘ্য, ওজন ও সংখ্যা

বিগত ২০০৩-০৪ সালে দেশে আহৃত ইলিশ মাছের বিভিন্ন দৈর্ঘ্য (Size group) অনুযায়ী উৎপাদন এবং সংখ্যা, আহৃত মাছের দৈর্ঘ্যের ঘটন সংখ্যা এবং দৈর্ঘ্য অনুযায়ী গড় ওজন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উক্ত বিশ্লেষণে প্রাপ্ত মাছের গড় দৈর্ঘ্য ও ওজন, ধৃত মাছের সংখ্যা, উৎপাদন এবং মোট উৎপাদনে প্রত্যেক সাইজ গ্রুপের অবদান নিম্নের সারণি-৬ এ প্রদান করা হলো ঃ-

সারণি-৬ঃ ইলিশ মাছের দৈর্ঘ্য, গড় ওজন, ধৃত মাছের সংখ্যা, উৎপাদন ও % অবদান (Contribution)

দৈর্ঘ্য (সে.মি.)	উৎপাদন (মে.টন)	গড় ওজন (গ্রাম)	ধৃত মাছের সংখ্যা (লক্ষ)	শতকরা ধৃত মাছের হার (%)
১৮-১৯	৭৬৮	১৩০	৫.৯১	০.৭৮
২০-২১	২০৪৮	১৫০	১৩.৬৫	১.৭৯
২২-২৩	৮৯৬০	১৮০	৪৯.৭৭	৬.৫৩
২৪-২৫	২৩,০৪০	২১০	১০৯.৭১	১৪.৩৯
২৬-২৭	৪০,৪৪৮	২৪০	১৬৮.৫৩	২২.১০
২৮-২৯	৪৩,৫২০	২৭৫	১৫৮.২৫	২০.৭৬
৩০	২০,১৫০	৩৫০	৬০.১৫	৭.৮৯
৩১	১৩,১৩০	৩৮০	২৯.৮০	৩.৯১
৩২-৩৩	২২,৭৮৪	৪৪০	৫১.৭৮	৬.৭৯
৩৪-৩৫	২১,৭৬০	৫৩০	৪১.৭৮	৫.৩৯
৩৬-৩৭	২১,৭৬০	৬৭০	৩২.৪৮	৪.২৬
৩৮-৩৯	১৭,৯২০	৮২০	২১.৮৫	২.৮৭
৪০-৪১	১১,৫২০	৯৫০	১২.১৩	১.৬০
৪২-৪৩	৫,৬৩২	১০৯০	৫.১৭	০.৬৮
৪৪-৪৫	২,৫৬০	১২২৫	২.০৯	০.২৭
সর্বমোট	**২,৫৬,০০০**	-	**৭৬২.৩৩**	**১০০.০০**

মৎস্য সম্পদ জরীপ শাখার তথ্যানুযায়ী ২০০৩-০৪ সালে দেশে উৎপাদিত ইলিশ মাছের পরিমাণ ছিল ২,৫৬,০০০ মে.টন। উক্ত সালে আহৃত মাছের দৈর্ঘ্যের ঘটন সংখ্যা এবং গড় ওজন বিশ্লেষণে দেখা যায় ঐ বৎসর সর্বমোট ৭.৬২ কোটি মাছ ধরা হয়েছিল। ধৃত মাছের দৈর্ঘ্য ছিল ১৮.০ সে.মি. হতে ৪৫.০ সে.মি. এবং দৈর্ঘ্যের গ্রুপ অনুযায়ী গড় ওজন ছিল ১৩০ গ্রাম হতে ১,২২৫ গ্রাম। এ সকল মাছের মধ্যে জাটকা আকারের (১৮-২৩ সে.মি.) মাছের সংখ্যা ও ওজন ছিল যথাক্রমে ৬৯.৩৩ লক্ষ, ১১,৭৭৬ মে.টন। একইভাবে ৩০.০ সে.মি. আকার পর্যন্ত মাছের সংখ্যা, ওজন এবং ধৃত মাছের শতকরা হার ছিল যথাক্রমে৫৬.৬০ কোটি, ১,৩৮,৯৩০ মে. টন ও ৭৪%। এখানে দেখা যাচ্ছে ৭৪% ধৃত মাছ হতে মাত্র ৫৪% উৎপাদন পাওয়া গিয়েছে। অপর দিকে ৩০ সে.মি. উর্দ্ধ আকারের ২৬% মাছ হতে প্রায় ৪৬% উৎপাদন পাওয়া গিয়েছে। পূর্বের অধ্যায়ে দেখা যায় ছোট আকারের মাছ অত্যন্ত দ্রুত (গড়ে প্রায় ২.০ সে.মি./মাস) বৃদ্ধি পায়। এ প্রেক্ষাপটে ৩০.০ সে.মি. আকার পর্যন্ত মাছ ১-৬ মাস পর্যন্ত নদ-নদী, সমুদ্রে রক্ষা করা সম্ভব হলে ইলিশ মাছের উৎপাদন বর্তমান উৎপাদনের দ্বিগুণ পাওয়া যেতে পারে।

১৪.ইলিশ মাছের মজুদ (Stock) নিরূপণের ফলাফল, ফলাফলের সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশনা মজুদ (Stock) নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা

মজুদ বলতে কোন একটি প্রজাতির এক গুচ্ছ মাছকে বুঝায় (A subset of one species) যাদের বৃদ্ধি, মৃত্যুহার, প্রজনন ও অনান্য Taxonomic বৈশিষ্ট্য একই রকম এবং এক বা একাধিক ভৌগলিক এলাকাতে বসবাস করে। একটি মজুদের সকল মাছের সাধারণ বংশগত বৈশিষ্ট্য (Common gene pool) থাকে। কাসিং (১৯৬৮) এর মতে মজুদ হচ্ছে কোন একটি প্রজাতির এক গুচ্ছ মাছ যাদের একটি প্রজনন গ্রুপ (Single spawning group) থাকে এবং যাতে প্রাপ্ত বয়স্ক মাছ বৎসরের পর বৎসর যোগদান বা প্রবেশন করে থাকে।

জলাশয়ে মাছের প্রাকৃতিক এবং আহরণজনিত মৃত্যু হয়ে থাকে। মাছের প্রাকৃতিক মৃত্যুহার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলেও আহরণজনিত মৃত্যুহার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। মাছের প্রবেশন এবং আহরণজনিত মৃত্যুহারের মধ্যে সমতা (Balance) রক্ষা না করে অতিরিক্ত আহরণ করা হলে যে কোন ষ্টক বা পপুলেশন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে সমতা রক্ষা করে যে কোন ষ্টক হতে বৎসরের পর বৎসর সর্বোচ্চ সহনশীল উৎপাদন লাভ করা সম্ভব। মজুদ নিরূপণের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে আহরণজনিত মৃত্যু হার এবং প্রাকৃতিক মৃত্যু হারের মধ্যে সমতা রক্ষা করে যে কোন ষ্টক হতে সর্বোচ্চ সহনশীল উৎপাদন লাভ এবং ঐ ষ্টকের ব্যবস্থাপনা কৌশল নির্ধারণ করা।

মজুদ নিরূপণের ধারণাটি মাছের বৃদ্ধি ও মৃত্যুহার এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। কোন ষ্টকের সকল মাছের বৃদ্ধি ও মৃত্যু যে কোন এলাকার জন্য একটি নির্দিষ্ট হারে (Constant) থাকে। এ প্রেক্ষাপটে, মাছের ঐ মজুদের প্রাকৃতিক মৃত্যুহার, আহরণজনিত মৃত্যুহার, প্রবেশন (Recruitment), বৃদ্ধির বয়স ও হার এবং প্রথম ধরার বয়স ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যাবলী নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করে উক্ত বৈশিষ্ট্যাবলীর আলোকে ইল্ড পার রিক্রুট, বায়োমাস (Biomass), সর্বোচ্চ সহনশীল উৎপাদন (Maximum sustainable yield) ইত্যাদি নির্ণয় করা হয়। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলীর সাথে মাছ ধরার প্রচেষ্টা (Fishing effort), মাছ ধরার জালের নৈর্বাচনিকতা (Gear selectivity), উৎপাদন ও জৈবিক পদ্ধতি (Biological process) ইত্যাদির সমন্বয় ঘটিয়ে ষ্টকের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নির্ণয় করা হয়।

ইলিশ মাছের মজুদ নির্ণয়ের ফলাফল ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশনা

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুরে ১৯৯২ সাল হতে ইলিশ মাছের ষ্টক এসেসমেন্ট করা হচ্ছে। নিম্নের সারণি-৭ এ প্রাপ্ত ফলাফল প্রদান করা হলো ঃ

সারণি-৭ঃ ইলিশ মাছের ষ্টক এসেসমেন্ট এর ফলাফল

ক্রমিক নং	প্যারামিটার	বৎসর ও ফলাফল						
		১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০২	২০০৩
১	সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য (Lc)	৫৯.৯৭	৬১.৫০	৬৬.০০	৬০.০০	৬২.৫০	৫৩.৭০	৫৩.৬০
২	বৃদ্ধির সহগ (K)/বছর	০.৯৯	০.৮৩	০.৬৭	০.৮২	০.৭২	০.৮৬	০.৬০
৩	মোট মৃত্যুহার (Z)/ বছর	৩.১৯	৩.২৯	৩.৪৩	৩.৭৭	২.৭৯	৩.৫১	৩.০৩
৪	প্রাকৃতিক মৃত্যুহার (M)/ বছর	১.৪১	১.২৮	১.২৫	১.২৮	১.১৭	১.৩৬	১.০৯
৫	আহরণ জনিত মৃত্যুহার (F)/বছর	১.৭৮	২.০১	২.১৮	২.৪৯	১.৬২	২.১৫	১.৯৪
৬	আহরণ মাত্রা (E)	০.৫৬	০.৬১	০.৬৩	০.৬৬	০.৫৮	০.৬১	০.৬৪
৭	সর্বোচ্চ আহরণ মাত্রা (Emax)	০.৭১	০.৬৯	০.৬০	০.৫৯	০.৪৬	০.৫৮	০.৬৩
৮	প্রথম ধরার দৈর্ঘ্য (Lc) সে.মি.	৩০.৩৪	৩০.২৫	২৭.০৬	২২.৮০	১৩.১২	১৯.৮৭	২১.২১
৯	বৃদ্ধির মাত্রা (Ø)	৩.৫৫	৩.৫০	৩.৪৬	৩.৪৭	৩.৪৫	৩.৫১	৩.০৩

উপরের সারণি-৭ হতে দেখা যায়, দেশে ইলিশ মাছের আহরণ মাত্রা তাত্ত্বিক সহনশীল আহরণ মাত্রার (০.৫০) চেয়ে বিগত ১৯৯৬ সাল হতে প্রায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সালে এ মাছের আহরণ মাত্রা সর্বোচ্চ আহরণ মাত্রার চেয়ে কম থাকলেও ১৯৯৮ সাল হতে আহরণ মাত্রা সর্বোচ্চ আহরণ মাত্রার চেয়ে যথাক্রমে শতকরা ৫, ১১, ২৬, ৫ এবং ২ ভাগ বেশী হয়েছে। সর্বোচ্চ আহরণ মাত্রার চেয়ে বেশী মাত্রায় মাছ আহরণ যে কোন ষ্টক বা মজুদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ইলিশ মাছের প্রাকৃতিক মৃত্যুহার (M) কমবেশী প্রায় একই রূপ (১.১৬ হতে ১.২৮) থাকলেও আহরণ জনিত মৃত্যুহার (F) বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশে ইলিশ মাছ ধরার প্রচেষ্টা (Fishing effort) ক্রমাগত ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অপর দিকে বাংলাদেশে ইলিশ মাছ ধরার প্রথম দৈর্ঘ্য (L_c) ১৯৯৬ সালের ৩০.৩৪ সে.মি. হতে হ্রাস পেয়ে ২০০৩ সালে ২১.১২ সে.মি. হয়েছে। বিগত ২০০০ এবং ২০০২ সালে ইলিশ মাছ প্রথম ধরার দৈর্ঘ্য মাত্র ১৩.১২ ও ১৯.৮৭ সে.মি. ছিল। উক্ত বৎসর সমূহে ইলিশ মাছের বৃদ্ধির মাত্রা প্রায় একইরূপ (৩.০৩-৩.৫৫) থাকলেও ছোট আকারের মাছ বেশী পরিমাণে ধরার ফলে সার্বিকভাবে ইলিশের মোট উৎপাদন কম হয়েছে। ইলিশ মাছের মজুদ নিরুপণের ফলাফল নির্দেশনা প্রদান করে যে, ছোট আকারের ইলিশ মাছ ধরা বন্ধ করাসহ অতিআহরণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ইলিশ ষ্টকের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।

১৫. ইল্ড পার রিক্রুট (Y/R) ইলিশ মাছের প্রথম ধরার বয়স ও আহরণ মাত্রার সম্পর্ক

কোন মৎস্য কূলের সাথে প্রতি বছর ধরার যোগ্য (Vulnerable) আকৃতির নবীন মাছ নতুন ভাবে সংযোজন হওয়ার প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে প্রবেশন (Recruitment) বলা হয়। কোন মৎস্য কূলে প্রতি বৎসর গড়ে একক পরিমাণ মাছ (Unit fish) থেকে উৎপাদনে (Yield) যে পরিমাণ সংযোজন হয় তাহাকে ইল্ড পার রিক্রুট(Yield per recruit) বলা হয়। ইহাকে সংক্ষেপে Y/R দ্বারা এবং Y/R এর মান গ্রামে (Gram) প্রকাশিত হয়ে থাকে। Y/R একটি চলমান ও গতিশীল প্রক্রিয়া।Y/R একটি উৎপাদন সূচক (Y/R is a production index of any fish population in the open water system)। Y/R এর মানই হলো উৎপাদনের মাপকাঠি, যার মাধ্যমে উক্ত মৎস্য কূলের উৎপাদনের বর্তমান ও ভবিষৎ উৎপাদন সম্পর্কে পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

মুক্ত জলাশয়ের কোন মৎস্য কূলের উৎপাদনের একক (Y/R) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মাছ ধরার প্রথম বয়স (Tc) এবং আহরণ জনিত মৃত্যুহার (F) এর উপর নির্ভরশীল। Tc এবং F এর সমন্বয়ে মাছ আহরণ করা হলে সর্বোচ্চ Y/R দীর্ঘ সময়ের জন্য অপরিবর্তীত থাকে (Sparre and Venema, S.C. 1992)। উল্লেখিত মতামতের ভিত্তিতে বিগত ১৯৯৫ সালের মেঘনা নদীর ইলিশ কূলের ক্ষেত্রে Tc এবং F এর সমন্বয় বিশ্লেষণ করে সর্বোচ্চ Y/R = ২০১.৯০ হতে ২১০.১৫ গ্রাম পাওয়া যায় যখন Tc = ১.৭ হতে ১.৯ বৎসর বা ৩২ হতে ৩৫ সে.মি. এবং F এর মান থাকে ২.০ হতে ৩.৬ প্রতি বৎসর। উল্লেখিত বিশ্লেষণ থেকে বলা যায় Y/R এর মান কমপক্ষে ২০০ গ্রাম পেতে হলে ইলিশ কূলের প্রথম ধরার বয়স, Tc = ১.৭ বৎসর বা ৩২.০ সে.মি. হওয়া আবশ্যক। Tc এর মান ১.৭ হলে Y/R দীর্ঘকাল ধরে সর্বোচ্চ পাওয়া সম্ভব হবে এবং আহরণ মাত্রা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। অর্থাৎ বর্তমানে ইলিশ মাছ ধরায় নিয়োজিত জেলে সংখ্যার চেয়েও বেশী সংখ্যক জেলে মাছ ধরায় নিয়োজিত হতে পারবে। এমতাবস্থায় আহরণ মাত্রাকে ২.০ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে অথবা প্রথম ধরার বয়স (Tc) ১.৭ বা ৩২.০ সে.মি. করা সম্ভব হলে Y/R এর মান ২০১.৯০ হতে ২১০.১৫ গ্রাম পাওয়া যাবে। ফলে দীর্ঘকাল ব্যাপী ইলিশের সন্তোষজনক উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হবে।

১৬. ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা ও ব্যবস্থাপনা কৌশল

সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে অবাধে ইলিশ মাছ আহরণ করার ফলে এ মাছের প্রাকৃতিক ভাবে ডিম তথা পোনা উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। ব্যাপক ভাবে জাটকা ধরার ফলে এ মাছের নতুন প্রজন্মের প্রবেশন, জাটকাকে বৃদ্ধির সময় না দিয়ে ধরার ফলে গ্রোথ ওভার ফিসিং এবং পূর্ণ বয়স্ক মাছকে রক্ষা না করার ফলে রিক্রুটমেন্ট ওভার ফিসিং হচ্ছে। ইলিশ মাছের

জীবনচক্রের প্রায় সকল স্তরে আহরণ জনিত মৃত্যু হয়ে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন কারণে নদ-নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস, পরিবেশগত পরিবর্তন এবং জলজ দূষণের ফলে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের ইলিশ মাছের অনেক বিচরণ ও প্রজনন ক্ষেত্র এবং জাটকা ইলিশের চারণ ক্ষেত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এ সম্পদের গুরুত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণ কৌশল সম্পর্কে আমাদের দেশের প্রায় সকল স্তরের জনসাধারণের সচেতনতা অপ্রতুল। উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে ইলিশ মাছের সহনশীল উৎপাদন বজায় রাখা ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিম্নোক্ত কার্যব্যবস্থা এবং কৌশল অবলম্বন করা আবশ্যকঃ

- অধিক ডিম/পোনা উৎপাদনের জন্য ডিমওয়ালা ইলিশ মাছ সংরক্ষণ ও অবাধ প্রজনন সুবিধা সৃষ্টির জন্য অভয়াশ্রম ঘোষণা;
- জাটকা আহরণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা;
- প্রাকৃতিকভাবে ছোট আকারের ইলিশ প্রতিপালন করে বড় মাছ ধরা;
- ইলিশ মাছের প্রজাতিগত বৈচিত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া;
- ইলিশ মাছের অতি আহরণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা;
- ইলিশ মাছের আবাসস্থল ও পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা;
- ইলিশ মাছের আহরণ পরিসংখ্যান নির্ণয় পদ্ধতির উন্নয়ন করা;
- প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা;
- ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য আন্ত:প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা;
- ইলিশ ব্যবস্থাপনার জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতার উদ্যোগ নেয়া;
- ইলিশ উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরে জনবল বৃদ্ধি করা;
- ইলিশ ও জাটকা জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেয়া;
- ইলিশ জেলেদের জীবন ও জাল-নৌকার জন্য বীমা ব্যবস্থা এবং সুদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করা;
- ইলিশ মাছ পরিবহণ, বাজারজাতকরণের পদ্ধতি উন্নয়ন এবং মান নিয়ন্ত্রণ;
- ইলিশ মাছের বিভিন্ন প্রোডাক্ট তৈরী ও রপ্তানি বৃদ্ধি; এবং
- সকল স্তরের জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

১৭. ইলিশ ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়ন পদ্ধতি

১৭.১ ডিমওয়ালা মাছ সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক প্রজনন বৃদ্ধি

আমাদের দেশে প্রায় সারা বৎসর ইলিশ মাছ ধরা হলেও প্রতি বৎসর আগস্ট হতে অক্টোবর মাসে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে মাছ (৬০-৬৫%) ধরা পড়ে। উক্ত সময়ে প্রায় ৭০-৮০% মাছ পূর্ণমাত্রায় পরিপক্ক থাকে এবং অক্টোবর মাসের বড় পূর্ণিমার "জো" এর সময় সবচেয়ে বেশী পরিমাণে ডিম ছেড়ে থাকে। বৎসরের পর বৎসর ক্রমাগতভাবে এ সময়ে ব্যাপকভাবে পরিপক্ক মাছ ধরার ফলে প্রাকৃতিকভাবে ইলিশ মাছের ডিম উৎপাদন পূর্বের তুলনায় অনেক হ্রাস পেয়েছে। কাজেই প্রাকৃতিক ভাবে ইলিশ মাছের অধিক ডিম উৎপাদনের জন্য অক্টোবর মাসে বড় পূর্ণিমার "জো" এর সময় প্রধান প্রধান প্রজনন ক্ষেত্রে কিছুদিন মাছ আহরণ বন্ধ রাখা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে মেঘনা নদীর মোহনায় ইলিশ মাছের প্রধান প্রজনন এলাকায় উক্ত বড় পূর্ণিমার ১০ দিনের এক জো, ৩০ আশ্বিন হতে ৯ কার্ত্তিক পর্যন্ত (১৫-২৪ অক্টোবর) ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ আইন প্রণয়ন করে ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে (চিত্র-৮)। উক্ত নিষিদ্ধ এলাকার সীমানা নিম্নরূপঃ

উত্তর-পশ্চিম ঃ উত্তর তজমুদ্দিন/ পশ্চিম সৈয়দ আওলিয়া পয়েন্ট (জিপিএস পয়েন্ট ৯০° ৪৯´ ১২.০০´´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ২২° ১৯´ ৫৬.৪০´´ উত্তর অক্ষাংশ);

উত্তর-পূর্ব ঃ শাহের খালী/ হাইতকান্দী পয়েন্ট, মীরসরাই (জিপিএস পয়েন্ট ৯১° ২৮´ ৫৫.২০´´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ২২° ৪২´ ৫৭.৬০´´ উত্তর অক্ষাংশ);

দক্ষিণ-পশ্চিম ঃ লতা চাপালি পয়েন্ট, কলাপাড়া (জিপিএস পয়েন্ট ৯০° ১২´ ৩৯.৬০´´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ২১° ৪৭´ ৫৬.৪০´´ উত্তর অক্ষাংশ);

দক্ষিণ-পূব ঃ উত্তর কুতুবদিয়া/ গভামারা পয়েন্ট (জিপিএস পয়েন্ট ৯১° ৫২´ ৫১.৬০´´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ২১° ৫৫´ ১৯.০০´´ উত্তর অক্ষাংশ)।

উপরে উল্লেখিত চারটি পয়েন্ট চারটি সরল রেখা দ্বারা যোগ করা হলে প্রায় ৬,৯০০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের একটি আয়তকার ক্ষেত্রের সৃষ্টি হবে। উক্ত ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে ৩০ আশ্বিন হতে ৯ কার্ত্তিক বা ১৫ অক্টোবর হতে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত ১০ দিন ইলিশ মাছ ধরা বা এ উদ্দেশ্যে যে কোন প্রকার জাল ব্যবহার করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ আইন অমান্য করে ইলিশ মাছ ধরা বা ধরার কারণ সৃষ্টি করা হলে জাল-নৌকা বাজেয়াপ্ত এবং জেল ও জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও কোষ্টগার্ড মোতায়েনসহ মৎস্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তিবর্গের সহযোগীতায় আইন বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

১৭.২ জাটকা সংরক্ষণ

জাটকা হচ্ছে ইলিশ মাছের নতুন প্রজন্মের প্রবেশন স্তর। তাই "জাটকা ধরা হলে ইলিশ মাছ লোপ পাবে" (Jatka caught, hilsa is lost)। জাটকা নিধন বন্ধ করার জন্য দেশে প্রচলিত মৎস্য সংরক্ষণ আইন (হিলশা) বাস্তবায়ন অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের পাশাপাশি বাংলাদেশ নৌবাহিনী, কোষ্ট গার্ড নিয়োজিত করা, প্রশাসনের সহযোগীতা গ্রহণ এবং আইন সংশোধন (কারেন্ট জাল উৎপাদন, বাজারজাত নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি) এবং আইন লংঘনকারীদের সাজার মেয়াদ ইতোমধ্যে বৃদ্ধি করে আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

কোন জলাশয়ের মাছের জীববৈচিত্র সংরক্ষণের সহজতম ও কার্যকর পদ্ধতি হচ্ছে অভয়াশ্রম ঘোষণা করা। জাটকা সহ অন্যান্য মাছের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য জাটকার প্রধান বিচরণ ক্ষেত্রে নিম্নে উল্লেখিত চারটি অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে (চিত্র-১৪)। অভয়াশ্রমের এলাকা ও বাস্তবায়নের সময় নিম্নরূপঃ-

ক্রমিক নং	অভয়াশ্রমের এলাকা	মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়
১।	চাঁদপুর জেলার ষাটনল হতে লক্ষীপুর জেলার চর আলেকজান্ডার (মেঘনা নদীর নিম্ন অববাহিকার ১০০ কি.মি. এলাকা)	প্রতি বৎসর মার্চ হতে এপ্রিল
২।	ভোলা জেলার মদনপুর/ চর ইলিশা হতে চর পিয়াল (মেঘনা নদীর শাহবাজপুর শাখার ৯০ কি.মি. এলাকা)	প্রতি বৎসর মার্চ হতে এপ্রিল
৩।	ভোলা জেলার ভেদুরিয়া হতে পটুয়াখালী জেলার চর রুস্তম (তেতুঁলিয়া নদীর প্রায় ১০০ কি.মি. এলাকা)	প্রতি বৎসর মার্চ হতে এপ্রিল
৪।	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার আন্ধারমানিক নদীর ৪০ কি.মি. এলাকা	প্রতি বৎসর নভেম্বর হতে জানুয়ারী

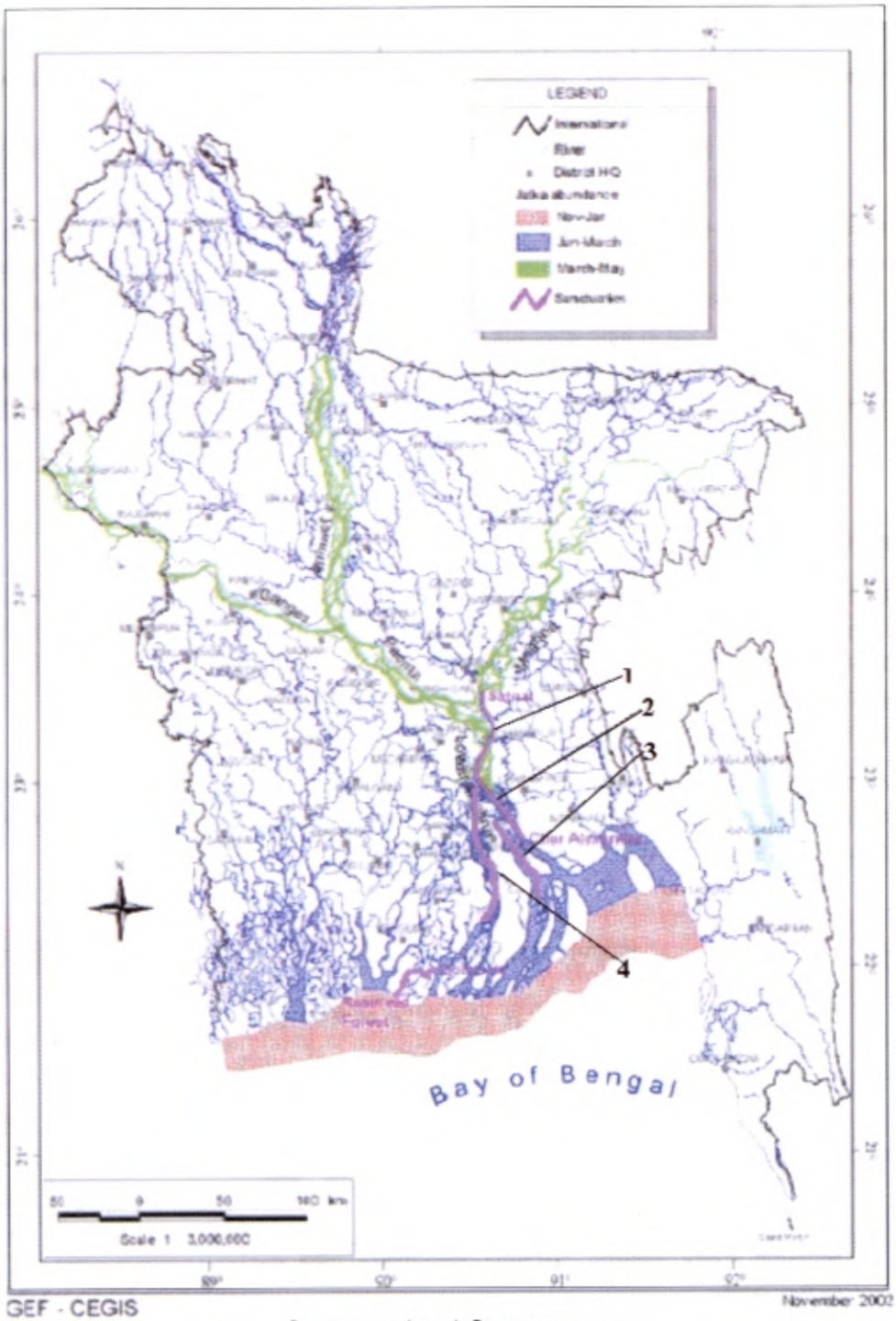

চিত্র-১৪ ঃ জাটকা ইলিশের অভয়াশ্রম

অভয়াশ্রম এলাকায় উপরে উল্লেখিত সময়ে জাটকাসহ সকল প্রকার মাছ ধরা বা এ উদ্দেশ্যে যে কোন প্রকার জাল বা মাছ ধরার যন্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ আইন অমান্য করে মাছ ধরা হলে বা মাছ ধরার কারণ সৃষ্টি করা হলে আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থা জাল-নৌকা বাজেয়াপ্ত (জব্দ) করাসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গকে জেল, জরিমানা বা উভয় প্রকার দন্ড প্রদান করতে পারবে।

১৭.৩ প্রাকৃতিকভাবে ছোট আকারের ইলিশ প্রতিপালন করে উৎপাদন বৃদ্ধি

ইলিশ মাছের বৃদ্ধির হার এবং আয়ু মধ্যম প্রকার। ছোট আকারের মাছ বড় মাছের চেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পায়। একই ইলিশ মাছ একাধিকবার নদী এবং সমুদ্রে পরিভ্রমণ (Migration) করে থাকে। এছাড়া ইলিশ মাছ সমুদ্র এলাকা হতে মোহনা ও নদ-নদীতে ঝাঁকে ঝাঁকে (batch-wise) প্রবেশের পর পরই সাগরে চলে যায় না। তারা মোহনা ও নদ-নদী এলাকার খাদ্য খেয়ে দ্রুত বড় হয় এবং ডিম ছাড়ার উপযুক্ত পরিবেশের জন্য (পোনার খাদ্য, পানির তাপমাত্রা, অক্সিজেনের পরিমাণ ও ঘোলাত্ব) অপেক্ষা করে। এ প্রেক্ষাপটে ছোট আকারের মাছ আহরণ নিষিদ্ধ করে প্রাকৃতিকভাবে প্রতিপালন করা হলে ইলিশ মাছের উৎপাদন বর্তমান উৎপাদনের প্রায় দ্বিগুণ পাওয়া যেতে পারে।

পূর্বের অধ্যায়ে (সেকসন-১৩) দেখা যায় ১৫-১৮ সে.মি. দৈর্ঘ্যের মাছ প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ২.৫ সে.মি. বা প্রতি মাসে ১″ বৃদ্ধি পায়। এ পর্যায়ে ৩০ সে.মি. আকার পর্যন্ত ইলিশ মাছ আহরণ নিষিদ্ধ করা হলে ১৮-২০ সে.মি. আকারের যে সমস্ত মাছ ধরা হয় তা মাত্র ৪ মাস পরে, ২০-২২ সে.মি. আকারের মাছ ৩ মাস পরে, ২২-২৪ সে.মি. আকারের মাছ ২.৫ মাস এবং ২২-২৪ সে.মি. আকারের মাছ ২.৪ মাস, ২৪-২৬ সে.মি. আকারের মাছ ১.৬ মাস এবং ২৬-২৮ সে.মি. আকারের মাছ মাত্র ১ মাস পরেই ধরার উপযুক্ত ৩০ সে.মি. আকারের হবে। এ প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন জাগতে পারে নদী ও সাগর হতে ইলিশ মাছ বাছাই করে নির্দিষ্ট আকারের ধরা সম্ভব কিনা? ইলিশ মাছ সাধারণতঃ জালের ফাঁসে আবদ্ধ করে এবং জালের পকেটে ধরা হয়। ফলে এ মাছ বাছাই করে ধরা সম্ভব। ইলিশ মাছ বাছাই করে ধরার জন্য জালের ফাঁসের আকার (Mesh size) নিয়ন্ত্রণ আইন করে ফাঁসের পরিমাপ নির্দিষ্ট করা হলে (Mesh size regulation) জেলেগণ নির্দিষ্ট ফাঁসের চেয়ে ছোট ফাঁসের জাল ব্যবহার না করলে শুধু কাঙ্খিত বা অনুমোদিত আকারের মাছই ধরা সম্ভব। আমাদের দেশে পূর্বে জেলেগণ সাধারণতঃ ৬ আঙ্গুল বা ৩″ (৭.৫ সে.মি.) চেয়ে ছোট ফাঁসের জাল ইলিশ মাছ ধরার জন্য ব্যবহার করত না। কোন ফাঁসে কত আকারের ইলিশ মাছ ধরা যাবে এ বিষয়ে বিস্তারিত সারণি-৯ এ প্রদান করা হয়েছে।

প্রাকৃতিকভাবে প্রতিপালন বা নির্দিষ্ট আকারের মাছ ধরার অন্যান্য সুবিধা

বড় আকারের ইলিশ মাছের বাজার মূল্য ছোট মাছের চেয়ে ২-৩ গুণ বেশী। কাজেই বাছাই করে বড় মাছ ধরা হলে জেলে, ব্যবসায়ীসহ সকলের আয়ই বৃদ্ধি পাবে এবং ইলিশ মাছ রপ্তানি করে অনেক বেশী পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। ইলিশ মাছ ৩০.০ সে.মি. আকার পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হলে জেলেদের সম্ভাব্য আয় বৃদ্ধির একটি হিসাব নিম্নের সারণি-৮ এ দেয়া হলোঃ-

সারণি-৮ঃ ৩০ সে.মি. আকার পর্যন্ত ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ করা হলে জেলেদের সম্ভাব্য আয় বৃদ্ধি

নিষিদ্ধ আকার	উৎপাদন (লক্ষ টন)	গড় মূল্য/কেজি (টাকা)	মোট মূল্য (কোটি টাকা)	মূল্য সংযোজন (কোটি টাকা)	জেলে প্রতি আয় (টাকা)	আয় বৃদ্ধি/জেলে (টাকা)
বর্তমান ২৩.০ সে.মি.	২.৮০	২০০.০০	৫,৬০০	-	১,২৪,০০০	-
৩০.০ সে.মি.	৪.৫০	৩০০.০০	১৩,৫০০	৭,৯০০	৩,০০,০০০	১,৭৬,০০০

*** ইলিশ জেলের সংখ্যা ৪,৫০,০০০ ধরে হিসাব প্রস্তুত করা হয়েছে।**

উপরের সারণি হতে দেখা যায় দেশে ইলিশ মাছ ৩০.০ সে.মি. আকার পর্যন্ত আহরণ নিষিদ্ধ করা হলে জেলে প্রতি বার্ষিক আয় প্রায় ১,৭৬,০০০ টাকা বৃদ্ধি পাবে এবং জাতীয় উৎপাদনে ৭,৯০০ কোটি অতিরিক্ত যোগ হবে। এছাড়া রপ্তানি আয়ও অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং জেলেদের জাল তৈরীর খরচ (ছোট ফাঁসের জালের মূল্য বেশী), জাল তৈরীর সময় ও মাছ ধরার সময় হ্রাস পাবে। বাজারে অধিক স্বাদের বড় আকারের মাছ পাওয়া যাবে। প্রাকৃতিকভাবে ইলিশ মাছের অধিক ডিম উৎপাদিত হবে এবং অতি আহরণ মাত্রা হ্রাস পাবে। এছাড়াও নদ-নদীর উজান এলাকায়ও মাছ পাওয়া যাবে। ফলে জেলেদের ইলিশ মাছ হতে আয়ের বন্টন অধিক সুষম হবে (নিম্ন এলাকায় ছোট মাছ ধরার জন্য উজান এলাকায় মাছ কম পাওয়া যায়)। জেলেদের আয় বৃদ্ধি পেলে অন্যান্য প্রজাতির ছোট মাছ ধরার প্রবণতাও হ্রাস পাবে এবং নদ-নদীর মাছের উৎপাদন সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা যায়।

নির্বাচিত আকারের ইলিশ ধরার আইন বাস্তবায়নের অসুবিধা

আমাদের দেশের জেলেগণ যথেষ্ট সচেতন নন। তাই আইন বাস্তবায়ন করা হলে কর্ম-সংস্থানের ভয়ে তারা ভীত হতে পারেন। এছাড়া বর্তমানে ব্যবহৃত ছোট ফাঁসের জাল পরিবর্তন করতে হবে যাহা যথেষ্ট ব্যয়বহুল হবে। আমাদের দেশে ছোট আকারের ইলিশ মাছের ভোক্তা সাধারণতঃ নিম্ন আয়ের মানুষ। ফলে নিম্ন আয়ের ভোক্তাগণ ইলিশ মাছ হতে বঞ্চিত হতে পারে।

১৭.৪ ইলিশ মাছের প্রজাতিগত বৈচিত্র সংরক্ষণ

চন্দনা ইলিশ এবং হিলশা কেলি/কানাগুর্তা প্রজাতির আহরণমাত্রা বাংলাদেশে হ্রাস পাচ্ছে। তাই ইলিশ মাছের সহনশীল উৎপাদন বজায় রাখা এবং প্রজাতিগত বৈচিত্র সংরক্ষণের জন্য উক্ত দুইটি প্রজাতির আহরণ মাত্রা, বিস্তার ও জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা কাজ সম্পাদন করে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন।

১৭.৫ ইলিশ মাছের অতি আহরণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশে ইলিশ সহনশীল মাত্রার চেয়ে অধিক মাত্রায় আহরণ করা হচ্ছে। কোন প্রাকৃতিক পপুলেশন হতে অধিক মাত্রায় মাছ আহরণ করা হলে উৎপাদনের গতিধারা সঠিক থাকে না এবং দীর্ঘ সময় ধরে এ অবস্থা চলতে থাকলে ঐ পপুলেশন ধ্বংশ হয়ে যেতে পারে। ইলিশ মাছের অতি আহরণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক ঃ

- পূর্বে আলোচিত জাটকা নিধন বন্ধ করা সহ ছোট আকারের মাছ না ধরা
- ইলিশ মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত জালের ফাঁসের আকার নিয়ন্ত্রণ;
- ইলিশ জেলে ও মাছ ধরার নৌকা নিবন্ধীকরণ এবং নতুন জেলেদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ।

আমাদের দেশে প্রধানত: ফাঁস জাল (gill net) দিয়ে এবং জালের পকেটে ইলিশ মাছ ধরা হয়। জালের ফাঁসের আকার ভেদে বিভিন্ন আকারের ইলিশ মাছ নির্বাচিতভাবে (selectively) ধরা পড়ে। জালের ফাঁসের দৈর্ঘ্য বড় হলে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের এবং ছোট হলে ছোট আকারের মাছ ধরা পড়ে। চলাচলের পথে জাল পাতা থাকলে ইলিশ মাছ জালের ফাঁসের মধ্যে দিয়ে অতিক্রমের চেষ্টা করলে জালের ফাঁস মাছের কানকোর পিছনে আটকে যায় ফলে মাছ ধরা পড়ে। আর ফাঁসের আকার বড় হলে মাছ ঐ জালের ফাঁসের মধ্যে দিয়ে বেড় হয়ে যায়। এভাবে বড় বা ছোট ফাঁসের জাল ব্যবহার করে নির্দিষ্ট আকারের ইলিশ মাছ নির্বাচিতভাবে ধরা সম্ভব। জালের ফাঁস ও উক্ত জালে ধৃত মাছের আকার সারণি-৯ এ দেয়া হলো।

সারণি-৯: ইলিশ মাছ আহরণে ফাঁস জালের নৈর্বাচনিকতা এবং একক প্রচেষ্টায় মাছ ধরার পরিমাণ (কেজি/১০০০ মি. দৈর্ঘ্য জাল/প্রতি ঘন্টায়)

ফাঁসের আকার (সে:মি)	ধৃত পুরুষ মাছ		ধৃত স্ত্রী মাছ		জাল ব্যবহারের হার (Effort) %	একক প্রচেষ্টায় মাছ আহরণের পরিমাণ
	দৈর্ঘ (সে.মি.)	সংখ্যা	দৈর্ঘ (সে.মি.)	সংখ্যা		
৬.০	২৫.৯ ± ০.১৭	২৫৬	২৮.৭ ± ০.৪৫	৬০	৭.৩১	০.৪৭ ± ০.০২
৭.০	২৮.৩ ± ০.২৯	২০৬	৩০.৪ ± ০.৩১	১০২	১২.৩২	০.৩১ ± ০.০৩
৮.০	৩১.৪ ± ০.১৩	৩৯৯	৩২.৯ ± ০.১২	৩৯৬	২৪.২০	০.২২ ± ০.০১
৯.০	৩২.০ ± ০.১০	২৫৩	৩৩.৬ ± ০.১৩	৩২৮	১৮.৭২	০.২৯ ± ০.০১
১০.০	৩৩.০ ± ০.৩৪	৮৭	৩৬.১ ± ০.১৫	৪৪৫	১৮.২৬	০.৪৫ ± ০.০৩
১১.০	৩৬.৪ ± ০.৩২	১০	৩৮.৭ ± ০.৪০	১১৩	৮.৬৮	০.৫৬ ± ০.০৬
১২.০	৩৫.৫ ± ০.৬৪	১৩	৪২.৭ ± ০.৪৪	৯৭	৭.৭৬	০.৬৩ ± ০.১১
১৩.০	৩৮.০ ± (১)	-	৪৪.৪ ± ০.৪৪	৪০	২.৭৩	০.০২ ± ০.৩৭

সারণি-৯ হতে দেখা যায় ৬.০ হতে ১৩.০ সে.মি. ফাঁসের জাল ইলিশ ধরার জন্য ব্যবহার করা হলেও ৭.০ হতে ১০.০ সে.মি. ফাঁসের জালে সবচেয়ে বেশী মাছ (৮০-৯০%) ধরা পড়ে। তবে ৫.০-৬.০ সে.মি. আকারের ফাঁসে অপেক্ষাকৃত ছোট এবং পুরুষ মাছ (২০.০ হতে ২৮.৭ সে.মি.) ও ১২.০-১৩.০ সে.মি. আকারের ফাঁসে সবচেয়ে বড় এবং অধিকাংশ স্ত্রী মাছ ধরা পড়ে। এ প্রেক্ষাপটে অপেক্ষাকৃত ছোট এবং বড় আকারের মাছ সংরক্ষণ সহ অতি আহরণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং অধিক ডিম উৎপাদনের জন্য আমাদের দেশে ৭.৫ হতে ১২.০ সে.মি. ফাঁসের ফাঁস জাল ব্যবহারের প্রচলন করা যেতে পারে।

বর্তমানে ইলিশ জেলে ও নৌকার সংখ্যা নিবন্ধন করার কার্যকর ব্যবস্থা প্রচলিত নেই। এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা

প্রয়োজন। এছাড়া দেশের সকল উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ ধরার অবাধ অধিকার (Open access) বলবৎ আছে। তাই জলাশয়ে অবাধ প্রবেশাধিকার পদ্ধতির পরিবর্তে সমাজ ভিত্তিক জলমহল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করে ইলিশ জেলে ও নৌকার সংখ্যা নিবন্ধন করত: নতুন জেলেদের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ এবং অতি আহরণ মাত্রা হ্রাস করা যেতে পারে।

১৭.৬ ইলিশ মাছের আবাসস্থল ও পরিবেশ উন্নয়ন এবং সংরক্ষণের উপায়

পূর্বে বাংলাদেশের প্রায় সকল প্রধান নদ-নদীতে ইলিশ মাছ পাওয়া যেত। কিন্তু বর্তমানে দেশের বাইরে এবং ভিতরে নানাবিধ বাঁধ নির্মাণের ফলে পানি প্রবাহ হ্রাস, পলিভরাট, জলজ পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি কারণে ইলিশ মাছের ব্যাপক আবাসিক এলাকা ধ্বংশ এবং অভিপ্রয়াণ পথে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে ফেণী, ছোট ফেণী, মুহুরি, কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী, কালিগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, ধনু, কালি নদী, হুরাসাগর, কুমার, নবগঙ্গা, চিত্রা ইত্যাদি নদীর ইলিশ মাছের আবাসস্থল সম্পূর্ণরূপে এবং গড়াই, মধুমতি, আড়িয়াল খাঁ, ভৈরব, মহানন্দা এবং পদ্মা নদীর উপরের অংশের আবাসস্থল প্রায় ধ্বংশের পথে। প্রতি বৎসর কৃষি জমি হতে প্রায় ২,৫০০-৩,০০০ মে.টন কীটনাশক ধৌত হয়ে বিভিন্ন জলাশয়ে পতিত হচ্ছে। কয়েক সহস্রাধিক শিল্প কারখানার অপরিশোধিত বিষাক্ত বর্জ্য, গৃহস্থালির বর্জ্য ও পয়:নিষ্কাশনের বর্জ্য সরাসরি বিভিন্ন নদ-নদী এবং উপকূলীয় এলাকায় ফেলা হয়। এ প্রেক্ষাপটে, ইলিশ সহ উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদকে রক্ষা করার জন্য জলজ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা অতীব জরুরী। ইলিশ মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত উপায় সমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে।

- নতুন কোন বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের বাঁধ এবং নদীতে আড়াআড়ি বাঁধ নির্মাণ বা ভূমি পুনরুদ্ধার কার্যক্রমগ্রহনের পূর্বে ইলিশ সম্পদের উপর এর প্রভাব বিবেচনা করে অভিপ্রয়াণ পথ মুক্ত রাখা;
- ইলিশ ও অন্যান্য মাছের অভিপ্রয়াণ, নৌ-চলাচল এবং সেচ কার্যক্রমের জন্য ধলেশ্বরী, মধুমতি, গড়াই ইত্যাদি নদী সমূহের তলদেশ খনন করে সংস্কার করা এবং ক্ষতিগ্রস্থ আবাসস্থল উন্নয়নের জন্য সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ;
- মৎস্য সম্পদ, নৌ-চলাচল, সেচ কার্যক্রমের জন্য নদী শাসন ও পানি ব্যবহার সম্পর্কিত জাতীয় পরিকল্পনা তৈরী এবং বাস্তবায়ন;
- পলিভরাট নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশব্যাপী বিশেষ করে উত্তর অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে বৃক্ষ রোপন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;
- দূষণ মাত্রা বিশ্লেষণ এবং যথাযথ বর্জ্য শোধন প্রক্রিয়া ছাড়া নতুন কলকারখানা স্থাপন বা নিবন্ধন নিষিদ্ধ করা;
- পানি দূষণের ফলে মৎস্য সেক্টরের ক্ষতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে একত্রে কাজ করা এবং ক্ষেত্র বিশেষে ক্ষতিরোধক স্মারক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করা;
- জলজ পরিবেশ দূষণ মোকাবিলা করার জন্য ESCAP (১৯৮৮) প্রণীত নীতিমালা সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের অনুসরণ ও প্রয়োগ করা আবশ্যক।

১৭.৭ ইলিশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি

ইলিশ মাছের গুরুত্ব এবং সংরক্ষণ ও উন্নয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে আপামর জনসাধারণ যথেষ্ট সচেতন নন। এ সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের জন্য সকল স্তরের জনসাধারণ ও প্রশাসনের সহযোগীতা প্রয়োজন বিধায় ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজন। মৎস্য অধিদপ্তর হতে ইতোমধ্যে এ বিষয়ে ব্যাপক কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

১৭.৮ ইলিশ মাছের আহরণ পরিসংখ্যান উন্নয়ন

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছের আহরণ পরিসংখ্যান নির্ণয়ের মডেলটি অতি উত্তম হলেও সময়ের বিবর্তন ও জলজ পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে উহা হালনাগাদ (Update) করা হয়নি। ফলে ইলিশ উৎপাদন সূচকের সাথে বাজারে ইলিশ মাছের প্রাপ্যতা ও মূল্যের যথেষ্ট গড়মিল দেখা যায়। সঠিক পরিকল্পনার জন্য সঠিক উৎপাদন পরিসংখ্যানের কোন বিকল্প নেই। তাই ইলিশ সহ অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছ আহরণ পরিসংখ্যান নিরুপণ পদ্ধতি হালনাগাদ করা অতীব জরুরী।

১৭.৯ প্রয়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন

ইলিশ একটি নবায়ন যোগ্য জলজ সম্পদ (Renewable aquatic resource)। ইলিশের জীবন চক্র বেশ জটিল। জলজ পরিবেশসহ জলবায়ুগত উপাদানের উপর এ মাছের উৎপাদন নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক এবং মনুষ্য সৃষ্ট নানা কারণে উক্ত বিষয়সমূহ প্রতিনিয়ত প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবেশ ও বাসস্থানের পরিবর্তনের সাথে ইলিশের প্রাচুর্য এবং জীবনবৃত্তে পরিবর্তন ঘটে থাকে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে ইলিশ মাছের উপর উল্লেখযোগ্য গবেষণা কাজ সম্পাদন করা হলেও এ মাছের বহুবিধ বিষয় এখনও অজানা। এ প্রেক্ষাপটে এ সম্পদের সুষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন গবেষণা কাজ পরিচালনা করা আবশ্যক।

১৭.১০ ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা বৃদ্ধি

ইলিশ মাছের ব্যাপ্তি অনেক বড়, আবাসস্থল বিস্তৃত এবং বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিবেশগত উপাদানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ সকল পরিবেশ ও পরিবেশগত উপাদান ব্যবস্থাপনায় ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান যথা-পানি উন্নয়ন বোর্ড, পরিবেশ অধিদপ্তর, শিল্প অধিদপ্তর, কৃষি ও বন অধিদপ্তর, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, মৎস্য গবেষণা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত। আবার ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যথা- প্রশাসন, পুলিশ, নৌবাহিনী, কোষ্টগার্ড, আইন ও বিচার বিভাগ, চলচিত্র ও তথ্য, স্থানীয় সরকার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, বণিক সমিতি, মৎস্যজীবি সমিতি, এনজিও ইত্যাদির সহযোগিতা প্রয়োজন। কাজেই ইলিশ মাছের সার্বিক উন্নয়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা ও সম্পর্ক আরও নিবিড় করা প্রয়োজন।

১৭.১১ ইলিশ ব্যবস্থাপনার জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা

ইলিশ মাছ বঙ্গোপসাগরের একটি অভিন্ন সম্পদ (Common resource)। বাংলাদেশ, ভারত এবং মিয়ানমারে ধৃত ইলিশ মাছ একই ষ্টকের অংশ বিশেষ। বাংলাদেশের ন্যায় ভারতের গঙ্গা নদীর অববাহিকার হুগলী-মাতলা মোহনা অঞ্চল, গোদাবরী, দয়া ইত্যাদি নদীতেও ইলিশ মাছের প্রজনন ক্ষেত্র আছে এবং প্রচুর পরিমাণে জাটকা ধরা পড়ে। কাজেই ইলিশের টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে যৌথ ব্যবস্থাপনা ও আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে। অন্যথায় এক দেশ এ মাছ সংরক্ষণের কাজ করে যাবে আর অন্য দেশ অতি আহরণে রত হলে আন্তঃদেশীয় কোন্দল সৃষ্টি হতে পারে। সাগর অঞ্চলে ইলিশ মাছের মজুদ বৃদ্ধির জন্য নো-টেক জোন বা অভয়াশ্রম ঘোষণা, যৌথ গবেষণা, পরিবেশ দূষণ এবং পরিবেশগত বিপর্যয় রোধ, পরস্পর তথ্যের আদান প্রদান এবং ইলিশের জন্য একটি আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরী সহযোগিতার মূল কেন্দ্র বিন্দু হতে পারে।

১৭.১২ ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য দক্ষ জনবল তৈরী, জনবল ও অবকাঠামো জোরদারকরণ

ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়নের জন্য অধিদপ্তরে দক্ষ জনবল অপ্রতুল। উপজেলা পর্যায়ে মাত্র একজন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও একজন সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা সার্বিকভাবে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ, মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন সহ অন্যান্য সকল উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কাজ বাস্তবায়ন করে থাকে। ইলিশ বা মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য মাঠ পর্যায়ে পৃথক কোন জনবল নেই। এ প্রেক্ষাপটে ইলিশ মাছসহ উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য উপজেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে যথাক্রমে সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা এবং সহকারী পরিচালক ও সদর দপ্তরে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/পরিচালকের (মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) একটি করে পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। বর্তমান জনবলের মধ্যে হতে দক্ষ জনবল তৈরীর জন্য ইতোমধ্যে ৪র্থ মৎস্য প্রকল্পের অধীনে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিভাগীয় প্রশিক্ষক তৈরী করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

১৭.১৩ ইলিশ ও জাটকা জেলেদের পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশের জেলে সম্প্রদায় ঐতিহ্যগত ভাবেই দরিদ্র। ইলিশ ধরার জন্য সাধারণতঃ তিনটি শ্রেণী যথা- নৌকার মালিক, প্রধান মাঝি ও নাবিক/শ্রমিক জড়িত। নৌকার মালিক তার নৌকা ও জাল প্রধান মাঝিকে ভাড়া দেয়, মাঝি পরিচালনা করে এবং শ্রমিক মাছ ধরে। শ্রমিক জেলেদের বাৎসরিক আয় মাত্র প্রায় ১৪,৪০০ টাকা যা অন্যান্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ের মাত্র ৩৭ ভাগ এবং জাতীয় গড় আয়ের মাত্র ২৫ ভাগ। ইলিশ ও জাটকা জেলেগণ বাংলাদেশের দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। যে সমস্ত জেলে প্রধান পেশা হিসাবে ইলিশ মাছ আহরণের উপর নির্ভরশীল তাদের ৬০ ভাগের চাষ যোগ্য জমি নেই, বাসস্থানের গড় আয়তন মাত্র ০.০৭ একর, অনেক ক্ষেত্রে নিজস্ব বাসস্থানও নেই, ৬০ ভাগেরও বেশী লোক নিরক্ষর, তারা সম্পদহীন ও নিম্ন আয়ের শ্রেণীভুক্ত। বিকল্প কোন কাজ থেকে আয়-উপার্জনও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। জীবিকা নির্বাহ তথা বেঁচে থাকার জন্য তারা জাটকা আহরণ করতে বাধ্য হয়। কাজেই ইলিশ মাছের টেকসই উন্নয়নের জন্য ইলিশ জেলেদের পুনর্বাসন ও জাটকা মৌসুমে বিকল্প কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

১৭.১৪ ইলিশ জেলেদের জন্য বীমা ব্যবস্থার প্রচলন ও সুদমুক্ত ঋণ প্রদান

ইলিশ জেলেরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদ-নদী ও সাগরে মাছ আহরণ করে থাকে। প্রায়শঃ বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন ঘূর্ণিঝড় এবং প্রবল জোয়ার-ভাটায় তাদের জাল-নৌকার ক্ষতি এবং জীবন হানি ঘটে। ফলে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ক্ষতিসহ অনেক পরিবার নিঃস্ব ও সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়ে। জেলেদের এ সকল ক্ষতিপূরণ ও ঝুঁকি মোকাবেলার ন্যূনতম ব্যবস্থা নেই। কাজেই জেলেদের জীবন ও জাল-নৌকা বিশেষভাবে মোহনা ও সমুদ্রগামী যন্ত্রচালিত জাল-নৌকার জন্য বীমা ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। বীমা ব্যবস্থা চালু করা হলে একদিকে যেমন জেলেরা ন্যূনতম ক্ষতিপূরণ পাবেন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সমর্থ হবেন। অন্যদিকে দেশে বীমা ব্যবসার ব্যাপক প্রসার হবে।

ইলিশ জেলেগণ তাদের জাল-নৌকা তৈরীর জন্য অধিকাংশ সময় মহাজনদের নিকট হতে উচ্চ সুদে ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

অথবা তাদের আহরণকৃত মাছ দাদনদারদের নিকট বিক্রির শর্তে জাল-নৌকার জন্য অর্থ গ্রহণ করে থাকে। মহাজনদের নিকট হতে গৃহিত ঋণের সুদ উচ্চ হারে থাকায় অধিকাংশ সময় তারা ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে দাদনদারদের নিকট হতে গৃহিত অর্থের জন্য তারা আহরণকৃত মাছ বাজার দর অপেক্ষা অনেক কম দামে বিক্রিকরতে বাধ্য হয়। ফলে ইলিশ আহরণ তাদের জন্য অধিকাংশ সময় লাভজনক হয় না। এ প্রেক্ষাপটে ইলিশ জেলেদের সহজ শর্তে সুদমুক্ত বা অল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৭.১৫ ইলিশ মাছ পরিবহণ, বাজারজাতকরণের পদ্ধতি উন্নয়ন এবং মান নিয়ন্ত্রণ

ইলিশ মাছ পরিবহণ প্রক্রিয়াও বেশ জটিল। সাগর এবং উপকূলীয় অঞ্চলের জেলেরা সাধারণত ক্রমাগত কয়েকদিন মাছ ধরে ধৃত মাছে বরফ দিয়ে নৌকার তাপ নিরোধক ষ্টোরে মজুদ করে। অতঃপর মাছ ধরা শেষে একই নৌকায় পরিবহণ করে উপকূলের পাইকারি বাজারে আড়ৎদারের মাধ্যমে বিক্রয়করে থাকে। দেশের বিভিন্ন নদ-নদী এবং অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ধৃত মাছ সরাসরি বিভিন্ন পাইকারি/খুচরা বাজারে বিক্রি অথবা মহাজনের ক্যারিয়ার বোটের নিকট হস্তান্তর করে থাকে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জেলেরা দিন-রাতের একটি নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত মাছ ধরার পর সরাসরি খুচরা বাজারে অথবা আড়ৎদারের মাধ্যমে বিক্রয় করে। আড়ৎদারের নিকট হতে মাছ ক্রয় করে খুচরা বিক্রেতাগণ স্থানীয় বাজারে এবং পাইকারগণ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বাজারে সড়ক পথ ও রেলযোগে প্রেরণ করে। সাধারণত বাঁশ অথবা হুগলা নির্মিত ঝুড়িতে মাছ রেখে মাছের উপরে এবং নিচে স্তরে স্তরে বরফ দিয়ে চট বা প্লাষ্টিকের আচ্ছাদন দিয়ে অথবা কাঠের বাক্সে একস্থান হতে অন্যস্থানে বা বাজারে ইলিশ মাছ পরিবহণ করা হয়। বাঁশ বা হুগলার ঝুড়ি এবং চট সর্ম্পূন তাপ নিরোধক না হওয়ার ফলে পরিবহণের সময় মাছের গুণগত মান বিনষ্ঠ হয় এবং ব্যবসায়ীগণ মাছের উপযুক্ত মূল্য পায়না। জেলেগণও মাছ ধরার পর যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করার ফলে মাছের গুণগত মান নষ্ট হয় এবং উপযুক্ত বাজার মূল্য হতে বঞ্চিত হয়। ফলে জেলে ও ব্যবসায়ীদের আর্থিক ক্ষতি হয় এবং ভোক্তাগণ পুষ্টিমান সম্পন্ন মাছ হতে বঞ্চিত হন। এ প্রেক্ষাপটে, ইলিশ মাছ ধরার পর যথাযথভাবে সংরক্ষণ, পরিবহণ, বাজারজাতকরণ সহ খুচরা বিক্রয় পর্যন্ত গুণগত মান সংরক্ষণ করা আবশ্যক।

ইলিশ মাছসহ অন্যান্য মাছের গুণগতমান বিনষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে মাছ ধরার পর দীর্ঘ সময় খোলা অবস্থায় বা সূর্য কিরণে রাখা, ধৃত মাছ নৌকা ও জলযানে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করা, প্রয়োজন অনুপাতে বরফ না মেশানো, বরফ প্রয়োগে বিলম্ব, তাপ অনিরোধক বাক্স, ঝুড়িতে পরিবহণ, গাদাগাদিভাবে মাছ রাখা, রাফ হ্যান্ডলিং এবং খোলা গাড়ীতে পরিবহণ করা ইত্যাদি। অধিকাংশ মাছের আড়ৎ এবং পাইকারি বাজার স্বাস্থ্য সম্মত নয়। এ ছাড়া দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে অপ্রতুল সংখ্যক বরফ কল এবং দীর্ঘ সময় ধরে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য হাজার হাজার টন ইলিশ মাছ পঁচে নষ্ট হয়।

ইলিশ মাছের গুণগত মান সংরক্ষণের জন্য উপরোক্ত অসুবিধা সমূহের প্রতিকার করা সহ ইলিশ জেলে ও ব্যবসায়ীদেরকে এ বিষয়ে সচেতন করা আবশ্যক। মাছ পরিবহণের জন্য বাঁশ, হুগলার ঝুড়ি, কাঠের বাক্সের পরিবর্তে তাপ নিরোধক প্লাস্টিকের বাক্স বা আইস বক্স, তাপ নিরোধক ভ্যান, গাড়ীর প্রচলন এবং রেলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বগি সংযোজন করা যেতে পারে। একই সাথে গুণগত মান সম্পন্ন অবতরণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, উন্নতমানের বরফ উৎপাদন ও জেলে ব্যবসায়ীদেরকে উন্নত সুযোগ সুবিধা ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। মাছ ধরার পর হতে বিক্রয়পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে ইলিশ মাছের গুণগত মান অক্ষুন্ন থাকলে জেলে, ব্যবসায়ীদের আর্থিক লাভসহ ভোক্তাগণ উপকৃত হবে এবং সার্বিকভাবে ইলিশ সম্পদের উন্নয়ন হবে।

১৭.১৬ ইলিশ মাছের বিভিন্ন প্রডাক্ট (Product) তৈরী ও রপ্তানি বৃদ্ধি

ইলিশ মাছের কৌটাজাতকরণ বা ক্যানিং এর ফলাফল অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট, নদী কেন্দ্রে, পরীক্ষামূলকভাবে উচ্চ চাপ এবং তাপ প্রয়োগে এ মাছকে কাটামুক্ত করে সফলভাবে কৌটাজাত করা হয়েছে। উক্ত কোটাজাতকরণ পদ্ধতি বাণিজ্যিকভাবে প্রচলন করা সম্ভব হলে কোটাজাত মাছ বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পথ সুগম হবে। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি দেশে ইলিশ মাছের লবনাক্ত ডিমের (ইৎরহব ংধষঃবফ ৎড়ব) ব্যাপক চাহিদা এবং উচ্চ বাজার মুল্য রয়েছে (প্রতিকেজি ৬০-৭০ আমেরিকান ডলার)। আমাদের দেশ হতে কিছু পরিমাণ ইলিশ মাছ মালয়েশিয়াতে রপ্তানি হলেও লবনাক্ত ডিম রপ্তানি হয়না। এ প্রেক্ষাপটে, ইলিশ মাছের লবনাক্ত ডিম প্রস্তুত করে রপ্তানি করা হলে অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ হতে প্রতি বৎসর ৫,০০০-১০,০০০ মে.টন ইলিশ মাছ বরফ দিয়ে ভারতে এবং হিমায়িত মাছের (ঋৎড়ুবহ ঋরংয) সাথে অনধিক ৩০,০০০-৪০,০০০ মে.টন ইলিশ মাছ মধ্য প্রাচ্যের কয়েকটি দেশ, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউরোপের অন্যান্য দেশ, অষ্ট্রেলিয়া এবং মালয়েশিয়াতে রপ্তানি করা হয়। উল্লেখিত দেশ সমূহে ইলিশ মাছের ব্যাপক চাহিদা এবং উচ্চ বাজার মূল্য আছে। ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হলে রপ্তানির পরিমাণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয় আরও বৃদ্ধি পাবে এবং সার্বিকভাবে সকল স্তরের জনসাধারণ ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে আরও আগ্রহী হবে।

১৮. ইলিশ ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগ্রহণ করেছেন যার বর্ণনা সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

১৮.১ ইলিশ ব্যবস্থাপনার জন্য আর্থিক খাত সৃষ্টি

ইলিশ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, জেলেদেরকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করার জন্য সরকার রাজস্ব বাজেটের অধীনে একটি আর্থিক খাত সৃষ্টি করেছে।

১৮.২ হিলশা ব্যবস্থাপনা কর্ম-পরিকল্পনা (Hilsa Management Action Plan) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং ইনস্টিটিউট পূর্ব ইলিশ গবেষণার ফলাফল, মৎস্য অধিদপ্তরের চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত সমীক্ষার ফলাফলের সমন্বয়ে হিলশা ব্যবস্থাপনা কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে উক্ত কর্ম-পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন এবং মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

১৮.৩ জাটকা রক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ নৌবাহিনী, কোষ্ট গার্ড, সিভিল প্রশাসন এবং জনগণকে সম্পৃক্ত করে জাটকা রক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন জোরদার করাসহ জাটকা রক্ষার জন্য ৪টি অভয়াশ্রম ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

১৮.৪ ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ আইন প্রণয়ন

ইলিশ মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন বৃদ্ধির জন্য এ মাছের সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে প্রধান প্রধান প্রজনন ক্ষেত্রে ১০ দিন ইলিশ মাছ আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

১৮.৫ ইলিশ জোন গঠন (Hilsa Zone)

ভোলা, বরিশাল, পটুয়াখালি, বরগুনা, পিরোজপুর, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, লক্ষীপুর জেলা সমন্বয়ে ইলিশ জোন গঠন করা হয়েছে এবং মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, শরিয়তপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর জেলা সমন্বয়ে ইলিশ জোন বর্দ্ধিত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

১৮.৬ জনবল তৈরী ও গণসচেতনতা সৃষ্টি

মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনবল তৈরী করা হচ্ছে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১৮.৭ জেলেদের খাদ্য সহায়তা প্রদান ও বিকল্প কর্ম-সংস্থান

জাটকার অভয়াশ্রম এলাকার জেলেদেরকে প্রতি বৎসর খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে এবং বিকল্প কর্ম-সংস্থানের জন্য একটি উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রধান জাটকা এলাকার ১১টি জেলায় জাটকা মৎস্যজীবিদের বিকল্প কর্মসংস্থানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১৮.৮ গণসচেতনতা সৃষ্টি

গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রমগ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন স্তরে প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, নৌ-র‍্যালী অনুষ্ঠান, বিভিন্ন প্রকার পুস্তক/পুস্তিকা, বুকলেট, লিফলেট, পোষ্টার, হ্যান্ডবিল প্রকাশ এবং গণ মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা ও বিল বোর্ড স্থাপন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১৯. ইলিশ ব্যবস্থাপনা কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুফল

১৯.১ ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি

ইলিশ উৎপাদনের গতিধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায় বিগত ২০০১-০২ সালের তুলনায় ২০০২-০৩ সালে দেশে ইলিশ উৎপাদন প্রায় ১০% হ্রাস পেয়েছিল। ইলিশ মাছের সহনশীল উৎপাদন বজায় রাখাসহ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ২০০৩ সাল হতে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে উক্ত ২০০২-০৩ সালের তুলনায় ২০০৬-০৭ সালে ইলিশ মাছের উৎপাদন প্রায় ৮০,০০০ মে.টন বা ৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত ৮০,০০০ মে.টন মাছের বাজার মূল্য প্রায় (গড়ে ২০০ টাকা/কেজি) ১,৬০০ কোটি টাকা যা জাতীয় আয়ে যোগ হয়েছে। বিগত ৪ বৎসরে জাটকা রক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের ফলে মোট ২.৯৩ লক্ষ মে.টন বর্ধিত উৎপাদন পাওয়া গিয়েছে যার বাজার মূল্য প্রায় ৫,৬৮০ কোটি টাকা।

১৯.২ ইলিশ মাছের গড় আকার এবং ওজন বৃদ্ধি

জাটকা রক্ষার ফলে ইলিশ মাছের গড় আকার এবং ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ২০০৩-০৪ সালে মাত্র ১% মাছ ১কেজি

উর্দ্ধ ওজনের পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু চলতি বৎসর প্রায় ৩১% মাছ ১ কেজি উর্দ্ধ ওজনের পাওয়া গিয়েছে। ফলে জেলেদের আয় ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ ইলিশ মাছের ডিম উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে।

১৯.৩ ইলিশ মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন বৃদ্ধি

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর হতে পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা যায় চলতি বৎসর প্রায় ৫% মাছ ডিম ছেড়েছে। চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প হতে পরিচালিত অনুরূপ সমীক্ষায় দেখা যায় বিগত ২০০৩ ও ২০০৪ সালে মাত্র ০.৮৭ ও ১.০% মাছ সফলভাবে ডিম ছেড়েছিল। চলতি বৎসর ইলিশ প্রজনন মৌসুমে মাছ আহরণ বন্ধ করায় উক্ত দুই বৎসরের তুলনায় ৫ গুণ বেশী মাছ ডিম ছাড়তে সক্ষম হয়েছে। ফলে চলতি বৎসর নদ-নদীতে জাটকার প্রাচুর্যও (abundance) বৃদ্ধি পাবে। এ সকল জাটকা সফলভাবে রক্ষা করা সম্ভব হলে ইলিশ উৎপাদনে আগামী বৎসরসমূহেও ইতিবাচক প্রভাব রাখবে বলে ধারণা করা যায়।

১৯.৪ জেলে-ব্যবসায়ীদের আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন

বিগত ২০০৩-০৪ সালে ইলিশ মাছের মোট উৎপাদন ১,৯৯,০০০ মে.টন এবং প্রতি কেজি ২০০ টাকা গড় মূল্যে ঐ বৎসর জেলে প্রতি গ্রস (Gross) আয় হয়েছিল ৮৮,০০০ টাকা। চলতি ২০০৬-০৭ সালে ২,৮০,০০০ মে.টন ইলিশ উৎপাদিত হওয়ায় জেলে প্রতি গ্রস আয় হয়েছে ১,২৪,০০০ টাকা অর্থাৎ প্রায় ৩৬,০০০ টাকা আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিক ইলিশ উৎপাদিত হওয়ায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান হয়েছে এবং দারিদ্র হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

২০. ইলিশ সংরক্ষণ আইন ও আইন ভংগের সাজা

সরকার ইলিশ মাছ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য দি ইষ্ট বেঙ্গল প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অব ফিস এ্যাক্ট, ১৯৫০; দি প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অব ফিস (এ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২; দি প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অব ফিস (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ২০০২ এবং দি প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অব ফিস রুলস, ১৯৮৫ এর অধীনে আইন এবং বিধি বিধান জারি করেছে। মৎস্য কর্মকর্তা বা পুলিশ কর্মকর্তার (সাব-ইন্সপেক্টর পদ মর্যাদার নীচে নয়) অভিযোগের ভিত্তিতে এ আইনের অধীনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। এ আইন ভংগ করা আমলযোগ্য অপরাধ (কগনিজিবল অফেন্স) এবং আইন ভংগকারীকে ক্ষেত্র বিশেষে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করা যাবে। এ আইনের আওতায় সরল বিশ্বাসে গৃহীত কোন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর মেজিস্ট্রেটগণ এ আইন ভংগের বিচার করবেন। ইলিশ সংরক্ষণ আইনের বিভিন্ন ধারা ও আইন ভংগের সাজা নিম্নরূপঃ

২০.১ জাটকা ধরা, ক্রয়-বিক্রয়, পরিবহন ও বাজারজাত করণ নিষিদ্ধ

জনপ্রিয়ভাবে জাটকা নামে পরিচিত ইলিশ মাছ ৯ বা ২৩ সে.মি. এর নীচের আকার প্রতি বৎসর ১লা নভেম্বর হতে ৩১শে মে পর্যন্ত ধরা, ক্রয়-বিক্রয়,হেফাজতে রাখা এবং পরিবহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

২০.২ ফাঁস জালের ব্যবহার নিষিদ্ধ আইন

উপরোক্ত ফিস এ্যাক্ট, রুল-১২ এর অধীনে মাছ ধরার জন্য ৪.৫ সে.মি (প্রায় ১.৭৭) বা তদপেক্ষা কম দৈর্ঘ্যের ফাঁস বিশিষ্ট ফাঁস জাল যা প্রচলিতভাবে কারেন্ট জাল/জাপানী কারেন্ট জাল/ফান্দি জাল/কাঁপা জাল/বাঁধা জাল/ কাঠি জাল নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

উপরোক্ত আইনসমূহ ভংগ করা হলে প্রথমবার আইন ভংগকারীর কমপক্ষে ১ মাস হতে সর্বোচ্চ ৬ মাসের কারাদন্ড এবং তৎসহ সর্বোচ্চ ১,০০০/- টাকা জরিমানা এবং পরবর্তী প্রতিবার আইন ভংগের জন্য কমপক্ষে ২ মাস হতে ১ বৎসর কারাদন্ড এবং তৎসহ সর্বোচ্চ ২,০০০/- টাকা জরিমানা হবে।

২০.৩ জাটকার বিচরণ ক্ষেত্রে অভয়াশ্রম ঘোষণা ও প্রজনন মৌসুমে ১০ দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ আইন

উপরোক্ত ফিস এ্যাক্ট, রুল ১৩ অধীনে জাটকা/ইলিশ মাছের ৪টি অভয়াশ্রম ঘোষণা করে প্রতি বৎসর মার্চ- এপ্রিল দুই মাস সকল প্রকার মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

একই আইনের বি তফসিলে ইলিশ মাছের সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে প্রতি বৎসর ১৫ অক্টোবর হতে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় ৭,০০০ বর্গ কি.মি. এলাকায় ইলিশ মাছ ধরা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। উক্ত আইন ভংগ করে মাছ ধরা হলে বা ধরার কারণ সৃষ্টি করা হলে ধৃত মাছ ও সরঞ্জাম আটক ও বাজেয়াপ্ত করা এবং আইন অনুযায়ী সাজা প্রদান করা যাবে।

জাটকা ধরা বন্ধ হলে-ইলিশ সম্পদ বৃদ্ধি পাবে

সহায়ক তথ্য গ্রন্থ

১. ড. এম. এ. মজিদ, এম. সিরাজুল ইসলাম, ১৯৯১। ইলিশ মাছ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।

2. Dr. G. C. Haldar, 2002. Hilsa Fisheries Management Action Plan for Bangladesh. Doc. No. 38.9: Department of Fisheries, Bangladesh, Dhaka.

3. Dr. G. C. Haldar, 2003. Hilsa Fisheries Management Action Implementation and Mitigation Program. Doc. No. 38.10: Department of Fisheries, Bangladesh, Dhaka.

4. Dr. G. C. Haldar, 2003. Trainers Training and Awareness Campaign Module: Hilsa Conservation and Management (in Bengali). Department of Fisheries, Bangladesh, Dhaka.

5. Dr. G. C. Haldar, 2004. Impact of Fishing Ban on Hilsa Production (In Bengali). Doc. No. 38.12: Department of Fisheries, Bangladesh, Dhaka.

6. Dr. G. C. Haldar, 2004. Baseline Socioeconomic Survey and Impact Assessment of Hilsa Fishing Ban on the Socioeconomic Condition of Hilsa Fishermen. Doc. No. 38.13. Department of Fisheries, Bangladesh, Dhaka.

7. Dr. G. C. Haldar, 2004. Review and Improvement to the Catch Monitoring System for Hilsa, Bangladesh. Doc. No. 38.14: Department of Fisheries, Bangladesh, Dhaka.

8. Dr. G. C. Haldar, 2004. Present Status of the Hilsa Fisheries in Bangladesh. Doc. No. 38.8: Final Report of the Studies Conducted under ARDMCS, GEF Component, Department of Fisheries, Bangladesh, Dhaka.

9. Dr. G. C. Haldar, 2006. A strategy Report on : Introduction of Selective Fishing of Hilsa, Impact and Benifits. Department of Fisheries, Bangladesh, Dhaka.

10. Dr. G. C. Haldar, 2006. Impact of Hilsa Management Options Implementation on Production and Livelihood of the Hilsa Fishers. Department of Fisheries, Bangladesh, Dhaka.